

# নারী-প্রসঙ্গ



শ্রীমতী সর্বমঙ্গলা দেবী



# বারী-প্রস্তুতি

শ্রীমতী সর্বমঙ্গলা দেবী

প্রকাশক :

শ্রীচুলীলাল রায়চৌধুরী

পোঃ সংসঙ্গ, দেওঘর, এস-পি

প্রথম প্রকাশ—১৩৬০

দ্বিতীয় প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৭৭

গ্রন্থকর্তা কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রফরীডার :

শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মুদ্রাকর : শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ

সংসঙ্গ প্রেস, পোঃ সংসঙ্গ

দেওঘর ( এস-পি )

মূল্য—টাকা 30

চিন্তা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান



## অর্ঘ্য

অমায়িক, উদার-চরিতা, পবিত্র-স্বভাবা, সর্বজনপূজ্যা, সাক্ষাৎ  
দেবীতুল্যা, মাতৃসমা আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরা  
শ্রীযুক্তেশ্বরী সরসীবালা দেবীর করকমলে

পূজনীয়া দিদি,

আমার আজিকার এ জীবন আপনারই দান। শৈশবে পিতৃহারা  
হইয়াছিলাম। সহায় ছিল না—আশ্রয় ছিল না। সংসারের কুটিল  
আবর্তে শ্রোতের ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া যাইতাম,—অখ্যাত,  
অজ্ঞাত—কেহ জানিত না। সেই অনাদৃত, অবহেলিত, তুচ্ছ পুষ্প-  
কোরকটিকে আপনিই পরম যত্নে, অতি সমাদরে আহরণ করিয়া আপনার  
পবিত্র গৃহের শুচিশূদ্র পুষ্পদানিতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে  
ভবিষ্যতের জন্ম মহৎ বা বৃহৎ কোন সম্ভাবনা নিহিত ছিল কিনা একমাত্র  
পরমপিতাই জানিতেন; মানুষের তাহা জানা তখন সম্ভব ছিল না।  
আপনার চেষ্টায়, আপনার যত্নে, আপনার স্নেহে যদি কোন স্নগন্ধ তাহা  
হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে, সে আপনারই কৃতিত্ব ও দয়ার দান। তাই  
তাহা আপনারই প্রাপ্য। সমগ্র জীবন অঞ্জলি ভরিয়া দান করিলেও  
যাঁহার স্বর্ণ এক কণিকাও পরিশোধ হয় বলিয়া মনে করি না—তাঁহার  
পাদপদ্মে এ ক্ষুদ্র উপহার অর্পণ করিতে মন স্বতঃই সঙ্কুচিত হয়! কিন্তু



ভক্তও তো তাহার ভগবানের চরণে তুচ্ছ বনফুলের অঞ্জলি দিয়াই  
তৃপ্ত হয়। আমিও সেই সাহসেই আমার এ অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ  
পুস্তকখানি হৃদয়-সিঞ্চিত ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া আপনার রাতুল  
চরণে অর্পণ করিয়া নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলাম। আপনি গ্রহণ  
করিয়া কৃতার্থ করুন।

দেওঘর

১৩৬০ বঙ্গাব্দ

}

আপনার চিরস্নেহাভিলাষিণী

দীন সেবিকা

শ্রীমতী সর্বমঙ্গলা দেবী



## দুই-চারিটি কথা

প্রত্যহ সকালে আমরা খবরের কাগজ খুলিয়াই কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই—দিকে-দিকে অনাচার, অবিচার আর অত্যাচার। শোষিতের আর্তনাদ, উৎপীড়িতের দীর্ঘশ্বাস আর বঞ্চিতের হাহাকার। খবরের কাগজের এই হইল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা-পরিবেশন। মন যায় খিঁচড়ে, প্রাণ ওঠে মূসড়ে—তাই চলনা হয় অবশ-শিথিল। কেন পত্রিকা দিনের পর দিন এমন সব খবর প্রকাশ করিয়া মানব-চিত্ত বিহ্বল করিয়া তোলে? কেন সে এক দিনের তরেও ইহার বিপরীত ঘটনা পরিবেশন করিতে পারে না? কি করিয়া পারিবে? দেশে অহরহ যাহা ঘটিতেছে তাহারই কিয়দংশ প্রকাশ করিয়া সে লোকচক্ষে তুলিয়া ধরিতেছে। কিন্তু কেন? এই অত্যাচার, এই অবিচারের প্রতিকার করিবার কি কেহই নাই? না, আজ দেশে তেমন মানুষ নাই যে এই দেশজোড়া অনাচারের-অবিচারের মোড় ফিরাইয়া ত্রায়, নীতি এবং সত্যের পথে দেশকে চালাইতে পারে। নাই তেমন কেহ, যে দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া আত্মের ক্রন্দন ও ব্যথিতের হাহাকার রোধ করিতে পারে। কিন্তু কেন নাই? ভারতভূমি বীর-প্রসবিনী। যুগ-যুগ ধরিয়া এই ভারতমাতা কত শত বীর পুত্র প্রসব করিয়া সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ভারতকে বিশ্বের দরবারে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ কেন এমন হইল কেন সে আজ সেই আসন হইতে বিচ্যুত হইবে? বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, নেতাজীর মত সন্তান প্রসব করিতে ভারতমাতা কি অক্ষম?



বিংশ শতাব্দীর ভারত কি সুসন্তান প্রসব করিতে ভুলিয়া গিয়াছে? কিন্তু কেন এমন হইল? কি ইহার কারণ? ইহার জন্ত দায়ীই বা কে? দেশ জোড়া আজ এই বিরাট জিজ্ঞাসা!

কিন্তু আমরা জানি, নারী ধাত্রী, নারী প্রসূতি, নারী মাতা। সন্তান ধারণ করিবার ক্ষমতা, প্রসব করিবার ক্ষমতা—আবার সন্তানের দেহ-মনের পরিমাপ সাধন করিয়া একটি বিশেষ নির্দিষ্টরূপে তাহাকে মূর্ত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা নারীতেই বর্তমান। নারী তাই মাতা ও জননী। আমাদের পুরাণে আছে, দেবগণকে অশুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেখিয়া ভগবতী উমা মহাদেবকে তপে তুষ্ট করিয়া অশুরবিনাশী কার্তিকেয়কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। অশুরারি কার্তিকেয়কে পুত্ররূপে লাভ করিয়া দেবগণকে বিপদ-মুক্ত করিবার ক্ষমতা মাতা ভগবতীতেই বর্তমান। আবার, সেজন্ত মাতার সাধনারও প্রয়োজন। দেহে-মনে শুচি হইয়া, উপযুক্ত সাধনার দ্বারা সুসন্তান লাভ করিবার ক্ষমতা নারীকে অর্জন করিতে হয়। সুসন্তান অনায়াস-লভ্য নহে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, “আদর্শ মাতাই আদর্শ সন্তানের অধিকারী। যিনি ধর্ম ও গ্রায়পরায়ণা, আদর্শবাদী, তাঁর কাছেই জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন নিজে হ’তেই আসে, সে রত্নের জন্ত জগৎ-সমুদ্র মন্থন করতে হয় না, দেশে-দেশে সে-রত্নের জন্ত ঘুরে বেড়াতে হয় না, আপনিই আসে।” তিনি আরও বলিয়াছেন, “যে সন্তান সাধনার দ্বারা জন্মলাভ করেছে—সেই আর্ঘ্য। আর অনাহুতের মত যে এসেছে, সে অনাৰ্য্য সন্তান।” দেশের বর্তমান এই দুর্দিনের অবসান ঘটাইতে হইলে, দেশকে আবার সুস্থ ও পুনর্জীবিত করিতে



হইলে—আবার ভারতকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইতে হইলে—সর্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শ মাতা, আদর্শ বধু ও আদর্শ কণ্ঠা। কারণ, নারী-জাতিকে ভুলিলে চলিবে না, “The hand that rocks the cradle rules the world.” আর সময় নাই—এখন হইতে অবহিত না হইলে সম্মুখে ঘোর দুর্দিন।

কেমন করিয়া এ সমস্তার সমাধান সম্ভব—কেমন করিয়া, কিরূপে নারীকে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া পুরুষের বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি দিয়া জীবনযুদ্ধে তাহাকে জয়ী করিয়া তুলিতে হইবে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস আমি আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। জানি না কতটুকু কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি। দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান অপরিসর, বুদ্ধি-বিবেচনা অতি সামান্য। আমার পক্ষে এরূপ গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করিতে যাওয়া ঋষ্টতারই পরিচায়ক হইয়াছে। তথাপি দেশের এই ঘোর দুর্দিনে প্রাণের আকুলতা, মনের ব্যাকুলতা চাপিতে না পারিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু করিয়া ফেলিলাম। আশা করি সুধী ও বিদ্বৎ সমাজ আমার এই ওদ্ধত্যকে মার্জনার চক্ষে দেখিবেন। আর, কোন সহৃদয় পাঠক যদি পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহার ভুল-ত্রুটি নির্দেশ করিয়া পুস্তকখানির উন্নতি সাধনে সাহায্য করেন তাঁহার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব! কারণ, ইহাই আমার প্রথম রচনা। ভুল-ত্রুটি থাকা খুব সম্ভব। আর একটি কথা, যাহাদের উদ্দেশ্যে এই বইখানি আমার লেখা—দেশের সেই মা, বোন ও মেয়েদের চিত্তে যদি ইহা এতটুকুও রেখাপাত করিতে পারে, বা তাঁহাদের চলার পথে যদি ইহা কোন আলোকপাত করিতে



পারে তবেই আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রথমে বইখানি প্রবন্ধাকারে ক্রমান্বয়ে তিনখানি পত্রিকা মারফৎ বাহির হইয়াছে। তাই অগ্র-পশ্চাৎ সামঞ্জস্য রাখিবার জন্ত হয়তো কোথাও-কোথাও দ্বিকল্পিত দোষ ঘটিয়া থাকিতে পারে।

পুত্র-প্রতিম শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, চুণীলাল রায়-চৌধুরী ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে আমার লিখিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে বাহির হইল। তাহাদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহানীর্বাদ রহিল।

ইতি—

লেখিকা



## ভূমিকা

আমার পরম পূজনীয়া মাসিমা'র লেখা নারী-প্রস্বস্তি পড়লাম। ইতিপূর্বে যখন পুস্তিকাখানির প্রবন্ধগুলি মাসিক আলোচনা, ত্রৈমাসিক ঐত্বিক ও দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখনই সেগুলি প'ড়ে ভালো লেগেছিলো খুব। ভূমিকার কয়েকটি কথা সেই সুরের প্রতিধ্বনি। \* \* \*

মানুষ পৃথিবীতে আসে-যায়। যতদিন ছনিয়ার বৃকে থাকে সে চায় সুখ ও শান্তি। এই কামনা নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই চিরন্তন কামনা। আদর্শ-পরায়ণ, বৈশিষ্ট্যপালী জীবন হ'লে এই কামনা ফলে-ফুলে সুশোভিত হ'য়ে গ'ড়ে তোলে আনন্দের লীলা-নিকেতন।

আর, এর ব্যতিক্রম হ'লে সেই আদর্শ-বিচ্যুত, বৈশিষ্ট্যহীন জীবন-চলনার প্রতি পদক্ষেপ সৃষ্টি করে সংঘাত ও বিপর্যয়। আসে দুঃখ, অশান্তি ও দুর্দশা।

জীবনের ভিত্তি হলো আদর্শ-নিষ্ঠা। আদর্শ-নিষ্ঠ সংযমী জীবন করে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ, তাই সংযম হলো জীবনের সৌন্দর্য্য। নিয়ন্ত্রিত জীবনের মাধুর্য্য হলো—ভক্তি, নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, মহত্ত্ব, দয়া, ক্ষমা ও সেবাপরায়ণতা। এই হলো জীবনের সম্পদ—সৌন্দর্য্য।

ব্যাপ্তি থেকে সমষ্টি জীবনের উন্নয়ন ও সুখ-শান্তি নির্ভর করে চলনার সার্থক সমন্বয়ের উপর।

সংসারক্ষেত্রে পুরুষের আদর্শ জীবন ও বৈশিষ্ট্যপালী চারিত্রিক



নিয়ন্ত্রণ যেমন অপরিহার্য্য সেইরূপ সম-দায়িত্বের ভার মাতৃজাতির  
জীবনেও।

মাতৃজাতির সেবা, সংরক্ষণ, সুপ্রজনন, গুশ্রবা প্রভৃতি গুণাবলীর  
উপর নির্ভর করে তার জীবনের পরম সার্থকতা।

নিষ্ঠা-শুদ্ধি-সমন্বিত নারীর এই আদর্শ-জীবন সঞ্জীবিত করে  
গৃহ-জীবনকে—দাম্পত্য জীবনে রচনা করে মধু-সম্বন্ধ। নারী-জীবনের  
সার্থকতায়, মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশে সন্তান-জীবন হয় বিকশিত।  
সুসন্তানের আবির্ভাবে হয় সমাজদেহ বলিষ্ঠ ও সুসংগঠিত—এই  
সুসংগঠিত সমাজই রাষ্ট্রীয় বনিয়াদকে করে সুদৃঢ়। সুদৃঢ় রাষ্ট্রীয়  
জীবনের বনিয়াদ জাতিকে করে সর্বতোভাবে সর্ববিষয়ে বরণ্য।  
তাই নারী মা, নারী পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী।

পুস্তিকাখানিতে মাতৃজাতির জীবনের খুঁটিনাটি বহু বিষয় অতি  
সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে।

আমি আশা করি এই পুস্তিকাখানি প্রতি প্রত্যেকের জীবন-  
পথের পাথের-স্বরূপ হইবে। ইতি—

সংসদ  
দেওঘর

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী  
( বড়দা )



## কুমারী কন্যার শিক্ষা

কুমারী কন্যার শিক্ষা, সংস্কার, আচার, ব্যবহার, চালচলন ও সাজসজ্জা কি প্রকার হইলে সংসারে তথা জাতীয় জীবনে কল্যাণ আনয়ন করিতে পারে আমরা একে-একে সেই আলোচনা করিব।

সমস্ত শিক্ষারই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বৈশিষ্ট্যের পরিপূরণ। মেয়েদের বৈশিষ্ট্য আছে—নিষ্ঠা, ধর্ম, গুণগ্রাম, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজ্ঞান। এই গুণগুলির সম্যক বিকাশই নারীত্বের পূর্ণতা। সুতরাং যে-শিক্ষার সাহায্যে মেয়েদের চরিত্রে এই গুণগুলির সম্যক বিকশিত হইবার সুযোগ পায় তাহাই হইল মেয়েদের আদর্শ শিক্ষা।

মেয়েরা ভাবী গৃহিণী ও জননী। মাতৃত্বই নারীর চরম ও পরম সার্থকতা। তাই প্রকৃতিদেবীও মেয়েদের বয়সের সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের দেহ ও মন মাতৃত্বের সকল সত্ত্বারে সুসজ্জিত করিয়া তোলেন। মেয়েদের শিক্ষাও তাই এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে সুগৃহিণী ও সুমাতা হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে।

অনেক সময় বয়স্ক কুমারী মেয়েরা নির্জনে বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করে। এটা অবিধি। বিখ্যাত মনীষী 'হল' বলেন—“নর-নারীর দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতার ফলে উভয়ের মনের হৃদয় অনুভূতি-প্রবণতা ও তারণ্যের দীপ্তি লোপ পাইতে চাহে, এবং এই ব্যাপারে বালকদের চেয়ে মেয়েদের ক্ষতি হয় বেশী।” তাই কুমারী জীবনে যাহাতে নিঃসম্পর্কীয় কোন পুরুষের ঘনিষ্ঠ ছাপ তাহাদের মস্তিষ্কে না পড়ে সে বিষয়ে অভিভাবকদের সর্বাত্মক দৃষ্টি রাখা উচিত। অত্যাধিক



তাহাদের দ্বিধাবিভক্ত দ্বন্দ্বভরা মন তাহাদিগকে নারীত্ব, বধূত্ব ও মাতৃত্বের কেন্দ্রানুগ আদর্শ হইতে স্থলিত করিয়া তুলিবে। অথ কোন শিক্ষাই তাহাদের জীবনকে সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিবে না।

তাই মনে হয়—“কুমারী মেয়েদের পিতার প্রতি অনুরক্তি থাকা, তাঁহার সেবা ও সাহায্য করা, তাঁহার সহিত আলাপ বা আলোচনা করা উন্নতির প্রথম ও পুষ্ট সোপান।” যাহাদের সে সুবিধা নাই তাহারা কোন শিক্ষিতা মহিলার নিকট পড়াশুনা করিলে ভাল হয়। তাহাও সম্ভব না হইলে পিতার সমতুল্য বা অধিক বয়স্ক কোন শিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করিতে পারে। অবশ্য স্কুলে বা কলেজের ক্লাসে অধ্যয়ন দোষাবহ নহে।

বেদমাতা গার্গি, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বহু ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহিয়সী মহিলার দৃষ্টান্ত আমাদের ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। এই সকল নারী-শিরোমণি মহিলাগণ তাহাদের জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের অধিকাংশকেই বধূ হইতে হইবে, মাতা হইতে হইবে। তাই তাহাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার সহিত উপযুক্ত গৃহকর্ম, সেবা-শুশ্রূষা, সন্তান-পালন, স্বাস্থ্যচর্চা, সদাচার, চাক্ষুশিল্প, কুটিরশিল্প প্রভৃতি কতকগুলি শিক্ষা যোগ করিয়া দেওয়া একান্ত দরকার। তাহা হইলে তাহারা বর্তমানের এই অর্থনৈতিক দুর্দিনে তাহাদের স্বামী-পুত্রকে ঘরে বসিয়াই বহু প্রকারে সাহায্য করিতে পারিবে।

নারীই গৃহলক্ষ্মী,—গৃহকে, সংসারকে, সর্বতোভাবে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলার দায়িত্ব নারীরই। আর, সে-ক্ষমতা জগদীশ্বর



তাহাদেরই পূর্ণ মাত্রায় দিয়াছেন।

মেয়েদের শিক্ষা সাধারণতঃ চাকুরী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়া মোটেই সমীচীন নহে। ইহাতে বহু নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সাধারণ মেয়েদের জীবন বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ; —ইহা প্রত্যক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন।

কুমারী মেয়েদের শিক্ষার আর একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়-সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিব। বিশেষ করিয়া এই শিক্ষাটির উপরই কুমারীদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হইবে কিংবা দুঃখের হইবে—তাহা জাতীয় জীবনে কল্যাণ প্রসব করিবে অথবা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে তাহা অনেকখানি নির্ভর করে। ইহা হইল কণ্ঠার পিতৃকুল হইতে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ পতি মনোনয়ন করিবার শিক্ষা। প্রত্যেক কুমারীরই গর্বের সহিত স্মরণ রাখা উচিত, তাহাদের মধ্যে যে জীবন প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তাহাদের পূর্ব-পূর্ব পুরুষদিগকে বহন করিয়া—যাঁহাকে অর্ঘ্য দিয়া তাহাদের পূর্ব-পূর্ব পুরুষগণ প্রীত ও ফুল্ল হন, যাঁহার বা যে-বংশের চরণ স্পর্শে তাহারা ধন্ত হন, নতজানু হইয়া শুধু তাঁহারই চরণে অবনত হওয়া যায়, তাঁহাকেই বরণ করা যায়—আর শুধু তাঁহাকেই স্বামী সম্বোধন করিয়া নিজে কৃতার্থ হওয়া, উজ্জল হওয়া যায় এবং বংশ ও জাতিকেও উন্নত করা যায়। শ্রেষ্ঠের প্রতি আসক্তিতে মস্তিষ্কে একটি টান লাগিয়াই থাকে—আর তাহারই দরুণ মানুষের মস্তিষ্ক বিশেষভাবে সাড়াপ্রবণ হয় অর্থাৎ গ্রহণক্ষম হয়। বরণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখা উচিত স্বামীর আদর্শ কি বা কেমন—আর, তাঁহার সেই আদর্শ কর্মের আগুনে নিজেকে আহুতি দিয়া সার্থক



হওয়ার আকৃতি নারীর কতখানি দুর্ব্বার। যদি সে কোন বিশেষ পুরুষের সহধর্ম্মিণী হওয়ার প্রেরণা নিজের মধ্যে লাভ করে—আর যদি তিনি জাতি, বর্ণ, বংশ ও বিদ্যায় বরণীয় হন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ হন, তাহার পূর্ব্বপুরুষের অর্ঘ্যণীয় বলিয়া বিবেচিত হন তবে তিনিই তাহার স্বামীরূপে গ্রহণীয় হইতে পারেন।

নারীর মনে রাখিতে হইবে—তাহার ভালবাসা যেখানে যেমন ভাবে গুস্ত হইবে—ফলের উদ্ভবও তেমনতরই হইবে সন্দেহ নাই।

“বিবাহ মানুষের প্রধান দুইটি কামনাকেই পরিপূরণ করে ;—তার একটি উদ্ভব, অণ্ডটি সুপ্রজনন ;—অনুপযুক্ত বিবাহে এই দুইটিকেই থিন্ন করিয়া তোলে ;—সাবধান, বিবাহকে খেলনা ভাবিও না, যাহাতে তোমার জীবন ও জনন জড়িত।” —শ্রীশ্রীঠাকুর।

বিবাহে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দায়িত্বই বেশী—সুসন্তান লাভ করা না-করা প্রধানতঃ নারীর উপরই নির্ভর করে। কারণ, সুপ্রজননকে নিয়ন্ত্রিত করে নারীর ভাব যাহা পুরুষকে উদ্দীপ্ত করিয়া নারীতে আনত করে। তবেই নারী যাহাকে বহন করিয়া কৃতার্থ ও সার্থক হইবে বিবেচনা করে—গুরুজনের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাকেই বর বলিয়া বরণ করা উচিত। তাই, বিবাহে পুরুষকে বরণ করার ভার নারীতে থাকাই সমীচীন। তাই, প্রাচীনকালে সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি নারীগণ তাঁহাদের নিজেদের পতি নিজেরাই অতি সুদৃষ্টভাবে নির্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিব্যক্তি ও এই গুরুদায়িত্ব ভার তাঁহাদের সুশিক্ষিতা এবং সর্ব্বগুণ-সম্পন্নতা কল্পনামাত্রের উপর গুস্ত করিয়াই নিশ্চিত ছিলেন। যেখানে



কন্যাদের বাল্যবিবাহ হয় সেখানে এ শিক্ষার প্রশ্ন আসে না। সেখানে অভিভাবকগণই তাঁহাদের বিবেচনানুসারে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিয়া আনেন। অত্যাধিক কন্যাগণ এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন—যাহাতে তাহারা কোনমতেই কোন একটি বিশেষ গুণ সমন্বিত কোন নারীমুখীন, আদর্শচ্যুত, নীচকুলোদ্ভব পুরুষকে পতিত্ব বরণ না করেন। “বর” মানে শ্রেষ্ঠ—“বৃ”-ধাতুর মানে বরণ করা ও প্রার্থনা করা। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—যে-সমস্ত গুণ থাকিলে পুরুষ পুরুষ হয়, সেই সমস্ত গুণ সর্বণ (সমান বা উৎকৃষ্ট বর্ণ), বিদ্বান, পুরুষত্ব বিষয়ে যত্নপূর্বক পরীক্ষিত, যুবা, জনপ্রিয় ব্যক্তিই বর হইবার উপযুক্ত। কেবল বিদ্যা বা কেবল জাতির দ্বারা পাত্রতা হয় না, যাহার বিদ্যা ও জাতি দুই-ই আছে সেই পাত্র।

যে-নারী যে-পুরুষের মনোবৃত্তির অনুসরণ স্বেচ্ছায় বলিয়া মনে করিয়া তাহাতে ধন্য হয়, হৃষ্ট হয়, সার্থক হয়—পুরুষকে হৃষ্ট ও তুষ্ট করিয়া তোলে এবং তাই তার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি ও তৃষ্টির উর্ধ্বর উৎস।

সেই পুরুষ ও নারীর বর্ণ, বংশ, কর্ম, বিদ্যা, দক্ষতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি হিসাবে মিলন বাঞ্ছনীয়। এইরূপ মিলনেই নারী সুসন্তানের জননী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে।



## বিবাহ

Man's love is of man's life a thing apart. 'Tis  
woman's whole existence.

—Byron

পুরুষের জীবন বহির্গামী, কর্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। বাহিরের কাজে  
নানা সমস্তার সমাধানে পুরুষের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত  
হয়। গৃহ, ভালবাসা, নারী—পুরুষের হৃদয়ের একটি অংশকে মাত্র  
প্রভাবান্বিত করিতে পারে, সমগ্র জীবন বা কর্মকে রঞ্জিত করিতে  
পারে না। অবশ্য, আদর্শপরায়ণ প্রকৃত পুরুষ—মহান, উদার, পূরণকারী,  
সঙ্কীর্ণতার বহু উর্দ্ধে যে সমাসীন—শুধু তারই সম্বন্ধে ঐ কথা প্রযোজ্য।  
কিন্তু নারীর স্বভাব ঠিক ইহার বিপরীত। যে ধারণ করে, পালন  
করে, পোষণ করে সেই নারী। নারীর সহজাত সংস্কার বধু হওয়া  
—মা হওয়া। একটি ছোট মেয়েকে মা বলিয়া ডাকিলে সে যত কোমল  
হয়, খুসী হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। একটি বালিকা অতি  
শিশুকাল হইতেই বৌ সাজিয়া পুতুল খেলে, সেই পুতুলকে ঘুম  
পাড়ায়, আদর করে, বিয়ে দেয়, এমনি ক'রে তার স্পৃহা মাতৃত্বকে  
পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু একটি ছোট ছেলের খেলা ইহার সম্পূর্ণ  
বিপরীত। সে কখনও খেলাঘর পাতিয়া সংসার সাজাইয়া বসে না,  
সে কখনও ছুটাছুটি, কখনও হয়তো লাঠি, ছোরা, বন্দুক নিয়ে রাজা-  
রাজা বা ডাকাত-ডাকাত খেলিতেই বেশী পছন্দ করে। এইগুলি  
লক্ষ্য করিলেই আমরা নারী-পুরুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির পার্থক্যের



পরিচয় তাদের শিশুকাল হইতেই পাইতে পারি। তবু বিধির বিধান, সৃষ্টি রক্ষার উদ্দেশ্যে উত্তর জীবনে এই দুইটি সম-বিপরীত সত্তার জীবকে মিলিত হইয়া সংসার করিতে হয়। এই মিলনকেই আর্য্য-শাস্ত্রকারেরা বিবাহ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বিবাহ মানে (বি-বহ্ + ঘণ্)—বিশেষ প্রকারে বহন করা। এই বহন করার ব্যাপারে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দায়িত্বই বেশী, কারণ, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক হইতেই বিবাহ নারীরই বেশী প্রয়োজনীয়। নারীর স্বভাব লতার মত, কোন উপযুক্ত সহকারকে অবলম্বন করিতে না পারিলে সে আপনি বাড়িতে পারে না, আর সুগন্ধি কুশুমে নিজে সুসজ্জিত হইয়া তাহার চারিদিক আমোদিত করিতে পারে না। তাই পরম উদাসীন, বহিষ্কৃত পুরুষকে সেবায়, সাহচর্য্যে, প্রেমে তৃপ্ত করিয়া আপনার নীড় বাঁধবার কামনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হয় নারীকেই। সেইজন্তই নারীকে সুস্থ, স্বস্থ, তৃপ্ত থাকিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিবার জন্ত আর্য্য ঋষিগণ বিবাহকেই নারীর শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সংস্কার বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। নারীর শিক্ষা ও সংস্কার শৈশব হইতেই এমনতর হওয়া উচিত যাহাতে সে মহাসতী উমার মত—মহাযোগী মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রসাদ-স্বরূপ গণপতি, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে কোলে পাইয়া নারী-জীবন কৃতার্থ করিতে পারে।

অতি প্রাচীন কালে সমাজে নির্দিষ্ট বিবাহ প্রথা ছিল না, নর-নারীর যথেষ্ট মিলন প্রচলিত ছিল। নারী বহু পুরুষে এবং পুরুষ

(২)



বহু নারীতে আকৃষ্ট হইলেও দোষণীয় হইত না। কালক্রমে বহু পর্য্যবেক্ষণের ফলে সমাজে বিবাহ ব্যবস্থা স্থাপিত হইল। উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু কোন অপরিচিত ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহার মাতার প্রতি অশিষ্ট আচরণ দর্শনে অপমানিত হইয়া প্রথমে বিবাহ প্রথার নিয়ম করিলেন।

শাস্ত্রমতে বিবাহ আট প্রকার,—ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য্য, প্রাজাপত্য, আশুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। বর্তমানে ব্রাহ্ম এবং প্রাজাপত্য বিবাহই হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। এই বিবাহে সদ্বংশজ, সচ্চরিত্র বরের বিদ্যাবুদ্ধি, চরিত্র প্রভৃতি বিশেষভাবে জানিয়া ধনরত্ন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া কন্যাকে দান করিতে হয়। বিবাহ ব্যাপারে যেমন কন্যার সুলক্ষণ কুলক্ষণের বিচার-বিধি সমাজে প্রচলিত আছে, বরের বেলায়ও সে-বিষয় সমভাবে প্রযোজ্য।

“আত্মজাং রূপসম্পন্নাং মহতাং সদৃশে বরে”

—মনু ২৪।২

“সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে পিতামাতা অনুরূপ বরের হাতে সমর্পণ করিবেন, অতথা তাহাদের ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হইবে।”

শাস্ত্রে অপাত্রে কন্যাদান অপেক্ষা কন্যা আজীবন কুমারী থাকাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা”—ইহাই ছিল প্রাচীন আৰ্য্য শাস্ত্রের নির্দেশ। জগতে সুপুত্র অপেক্ষা প্রার্থনীয় সম্পদ আর নাই। তা’ছাড়া পুত্র দ্বারাই পিতৃধন শোধ করা যায়, তাই বিবাহ করা প্রত্যেকের বিশেষতঃ পিতার একমাত্র পুত্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।



এই বিবাহ দ্বারাই মানুষ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে। চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সংসার ও সমাজ পরিপালন, অগ্রাগ্র আশ্রমিগণের পরিপোষণ, এমন কি ইতর প্রাণিগণের পরিরক্ষা এই গার্হস্থ্যাশ্রমেই হয়। বস্তুতঃ গৃহস্থকে বাদ দিলে সমাজ অচল।

“The city that ceases to be a city of homes will cease to be a city at all.”

—Mussolini

“যে নগরীতে গৃহস্থের গৃহ নাই, তাহা আর নগরী বলিয়া পরিচিত হইবে না।

—মুসোলিনী।

এই গৃহস্থের পক্ষে বিবাহ প্রকৃত ধর্ম। আর্য ঋষিগণের বহু বিবেচনা-প্রসূত বিবাহ দ্বারা মানুষ মনোবৃত্ত্যানুসারিণী সহধর্মিণী লাভ করে। সহধর্মিণী ব্যতীত সংসার-আশ্রমের সমুদয় কর্তব্য যথাযথ প্রতিপালিত হইতে পারে না। পতিব্রতা পত্নী কর্তব্যপরায়ণ পতির সহচারিণী ও সহকারিণী হইয়াই তাহার নারী-জীবনের চরম ও পরম উৎকর্ষের দিকে যাইতে থাকে। এইখানেই নারীর নারীত্ব প্রথম বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। স্বামীর সাহচর্যে তাঁহার সকল কর্তব্য সম্পাদনের সুষ্ঠু সহায়তা করিতে-করিতেই সে তাহার উত্তর জীবনের সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে যত আদর্শ পত্নী হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে—আদর্শ পুত্র লাভের সৌভাগ্য তাহারই করায়ত্ত—তত নিশ্চিত। এ বিষয় আমরা পরে আরও ভালভাবে আলোচনা করিব।



বিবাহ-সংস্কারে শাস্ত্রীয় আরও দুইটি অনুষ্ঠান আছে, একটি “সপ্তপদীগমন” অপরটি “গুরুবরণ”। সপ্তপদীগমনে বর ও কণ্ঠা একত্রে সপ্তপদ অগ্রসর হইতে হয়। আমরণ সকল কাজে দম্পতি যে পরস্পরের সঙ্গী ও সহায়ক—তাহারই একটা আনুষ্ঠানিক রূপ সপ্তপদীগমন। আর গুরুবরণ সর্বাগ্রে করণীয়,—কেন না, গুরু বা আদর্শই বিবাহ-মিলনের সিমেন্ট স্বরূপ। আধ্যাত্ম্যে আদর্শকে সমাজ-জীবনে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্তই বিবাহ ব্যবস্থা।

কেবল দৈহিক প্রয়োজন বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রমী সমাজে বিবাহের চরম লক্ষ্য ছিল না; হিন্দুধর্ম্য পরিপূর্ণ মানব জীবন-যাপনের জন্ত বিবাহকে ধর্ম্যের অত্যন্তম অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে সমাজে স্থান দিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রীয় সংস্কারের মধ্যেও বিবাহকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন!

প্রাচীনকালে আর্যভারতে সর্বর্ণ বিবাহের সহিত অনুলোম অসর্বর্ণ বিবাহও সমান আদরণীয় ছিল। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কণ্ঠা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কণ্ঠা গ্রহণীয়। আবার, বৈশ্যের বেলায় বিপ্র, ক্ষত্রিয় ব্যতীত পৃথিবীর যে-কোন জাতির কণ্ঠা অনুলোমক্রমে গ্রহণীয় ছিল। উচ্চবর্ণের পুরুষ যদি তদপেক্ষা নিম্নবর্ণের নারীর সহিত বিবাহস্থত্রে মিলিত হয় তাহাকেই অনুলোম অসর্বর্ণ বিবাহ বলে। অবশ্য, বিপ্রের সহিত শূদ্র কণ্ঠার বিবাহ যদিও শাস্ত্রসম্মত তথাপি প্রশংসনীয় নহে। কারণ, এই প্রকার বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের মানসিক উৎকর্ষের ব্যবধান খুব বেশী হওয়াতে স্ত্রী স্বামীকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই সন্তান-



সন্ততিও প্রায়ই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না।

উচ্চবর্ণের প্রতি নিম্নবর্ণের সাধারণতঃ একটা সহজ শ্রদ্ধা থাকেই। তাহা ছাড়া, মেয়েরা যদি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কোন উচ্চ বর্ণের পুরুষকে বরণ করে, তাহা হইলে তখন তাহাদের সে-শ্রদ্ধা যে কতখানি প্রবল হইয়া ওঠে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি উচ্চবর্ণের পুরুষ শ্রদ্ধাসহকারে আত্ম-সমর্পিতা কোন নিম্নবর্ণের স্ত্রীর সহিত শাস্ত্রসম্মতভাবে পরিণীত হয়, তবে তাহাদের সন্ততি স্বভাবতঃই সুস্থ ও সবল দেহ এবং উচ্চবর্ণানুরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

“যাদৃগ্ গুণেন ভর্তা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।

তাদৃগ্গুণা সা সমুদ্রেণৈব নিয়গা ॥”

— মনুসংহিতা।

অর্থাৎ, নদী যেমন সাগর-সংযুক্ত হইয়া লবণাক্ত হইয়া থাকে, তেমনি নারী-জাতিও যে-প্রকার সাধু বা অসাধু ব্যক্তির সহিত বিবাহসূত্রে মিলিত হয় সেই প্রকার গুণবিশিষ্টা হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী ও মন্দপাল-পত্নী শারঙ্গী ইহার অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত। যদিও ইহারা উভয়েই শূদ্রকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি উৎকৃষ্ট পতিলাভ করিয়া নিজের উৎকর্ষের বলে জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। উন্নতি কথার মানেই উর্দ্ধে আনতি। এবং এই উচ্চের প্রতি আনতি অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও তদনুসরণ প্রবৃত্তি হইতেই মানুষ নিজে ধীরে-ধীরে উন্নত হইয়া ওঠে। এই নিয়ম স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে আমরা কেবল নারীর কথাই আলোচনা করিব। শ্রদ্ধা,



অনুসন্ধিৎসা ও সেবার দ্বারা নারী উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সেই উর্বর ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজের সহযোগে নারী উত্তম ফল প্রসব করিতে সক্ষম হয়। আর, উত্তম বীজ পাইতে হইলে উৎকৃষ্ট বংশের—উচ্চ বর্ণের প্রয়োজন। এইখানেই বংশানুক্রমিকতা অর্থাৎ Law of Heredity আসিয়া পড়ে। আজকাল অনেকে মনে করিতেছেন যে পুরুষ যে-বর্ণের বা যে-বংশেরই হউক না কেন শিক্ষিত, অর্থবান, স্বাস্থ্যবান ও চরিত্রবান হইলেই সে বিবাহে গ্রহণযোগ্য। ইহা যে কতদূর মূর্থতার পরিচায়ক এবং সমাজ ও জাতির পক্ষে ইহা যে কতখানি ধ্বংসাত্মক তাহা প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন। কারণ, বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মানুষের এক পুরুষের উপার্জিত গুণরাজী (অর্থাৎ acquired qualifications) তাহার রক্তে কোনক্রমেই সংক্রামিত হইতে পারে না। ক্রমান্বয়ে পাঁচ-সাত পুরুষ যদি একই গুণের অধিকারী হইতে থাকে, তবে সেই গুণ তাহাদের বংশগত অর্থাৎ তাহাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বহু দেখা যায় কোন বংশের সন্তান অতি শিশুকালেই উৎকৃষ্ট গান গাহিতেছে; খোঁজ করিলেই দেখা যাইবে, তাহার বাপ, পিতামহ প্রভৃতি প্রত্যেকেই কম-বেশী গায়ক। এই নিয়ম আমরা পশু, পাখী এমন কি উদ্ভিদের বেলায়ও দেখিতে পাই। কি পাশ্চাত্য দেশে, কি আমাদের দেশে আমরা সকলেই ঘোড়া, গরু কিংবা কুকুর কিনিবার সময় তাহাদের বংশ দেখিয়া ক্রয় করি। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর দাঁড়াইয়াই ভারতীয় আৰ্য্য ঋষিগণ বর্ণাশ্রমের প্রবর্তন করিয়াছিলেন; যাহাতে বংশ পরম্পরায়



একই গুণ ও কর্মের অনুশীলনে জাতি অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

“বিবাহ ব্যাপারে পাত্র ও পাত্রীর উৎকর্ষ অপেক্ষা বংশ, বর্ণ ও জাতিগত বিচার ও বিবেচনা কম প্রয়োজনীয় নহে—বরং বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র উভয়েরই মতে অধিকতর প্রয়োজনীয় ও একান্ত আবশ্যক।”  
—শ্রীশ্রীঠাকুর।

“Heredity is an acquired fact—an experimental truth.”  
—Maurice Materlink.

তাই, সুপ্রজননের দিক দিয়া অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ তুচ্ছ তো নয়ই বরং অনুকূল অবস্থা হইলে প্রত্যেক সমাজের ইহা আগ্রহের সহিত গ্রহণীয়। আর, সমাজের দিক দিয়া এই প্রকার বিবাহে প্রত্যেক বর্ণের সহিত প্রত্যেক বর্ণের একটা স্বাভাবিক সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তা গড়িয়া ওঠে। ইহাতে জাতি যে কতটা জমাট ভাবাপন্ন ও শক্তিশালী হইয়া ওঠে তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। আর, এই তিন বর্ণই আধ্যাত্মিক। ইহাদের অন্ন, জল যদি উপযুক্ত শুচিতা ও আগ্রহের সহিত উৎসর্গীকৃত হয় তবে প্রত্যেক বর্ণই অপর বর্ণের অন্ন ও জল আদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাই শাস্ত্রের বিধান। আর, এইরূপ উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্নের সহিত অপেক্ষাকৃত নিম্নের মিলনে,—যদি এই মিলন প্রকার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়—নিম্ন ধীরে-ধীরে উচ্চের দিকে গমন করিতে থাকে, আর উচ্চও আরোতর উচ্চের দিকে পরিণতি লাভ করিতে থাকে। ইহাদের সন্তান-সন্ততিও পিতৃবর্ণেরই হইয়া থাকে।



কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রী যদি নিকৃষ্ট পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে তবে বলিষ্ঠদেহ কিন্তু দুর্বল মায়ু ও ক্ষীণ মস্তিষ্ক সন্ততি জন্মগ্রহণ করে।

“প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্নাস্তাভাগী নঃ।”

—বিষ্ণুসংহিতা।

আবার, সগোত্র বিবাহও হিন্দু শাস্ত্রকারেরা নিন্দনীয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্ত্রী সগোত্রা হইলে তুল্য অথচ বিপরীত-ধর্মী হয় না। একটা আর একটাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বিবাহ-মিলনে একজন অপর জনের অন্তর্নিহিত শক্তির ধারক ও পোষক হয় না।

“Marriage between blood relations is apt to accentuate the weakness in the family.”

—Herschfeld V.

সগোত্র বিবাহ হইলে প্রায়ই বিকলাঙ্গ, ক্ষীণজীবী ও অল্পায়ু সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাই, রক্ত-সম্বন্ধে দূরত্ব কথঞ্চিৎ বেশী হওয়া আবশ্যক—তাহাতে মিলন পূর্ণতর ও মঙ্গলপ্রসূ হয়।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যদেশের আইনেও সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ।

The Act of 1835 states —“All marriages between persons within the prohibited degrees of consanguinity and affinity shall be absolutely null and void to all intents and purposes.”



## নারীর বাল্য-বিবাহ

কাহারও শুভাশুভ নির্ণয় করিতে গেলে প্রথমে দেখা প্রয়োজন তাহার আন্তরিক চাহিদা কি, অর্থাৎ তাহার সহজাত সংস্কার কোন্ দিকে—কি পাইলে সে শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি লাভ করিয়া ক্রম-বর্দ্ধনার দিকে অবাধ গতিতে চলিতে পারে। এইগুলি বিচার করিয়া, যে পথ অবলম্বনে সে অনায়াসেই তাহার স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে তাহাই তাহার প্রকৃতি-নির্দিষ্ট মঙ্গলের পথ এবং সেই পথই তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিতে হইবে—কেননা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ কোন প্রকারেই প্রাণদ হইতে পারে না—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

সুতরাং, নারী-জাতীর প্রকৃত কল্যাণ, শান্তি, তৃপ্তি ও সার্থকতার পথ যদি আমাদের নির্দেশ করিতেই হয়, সর্বপ্রথমেই তাহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। তাহাদের শারীরিক পরিণতি কি প্রকার, তাহাদের আন্তরিক চাহিদারই বা রূপ কি—ইহাই সুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া নারী-জাতির প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্ধারণ করিতে যত্নবান হওয়া উচিত।

এখন আমরা বিচার করিয়া দেখিব নারীর বাল্য-বিবাহ তাহাদের জীবনে সার্থকতা, তৃপ্তি ও সুখ আনয়ন করে, না ইহা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্যয় ও বিধ্বস্তিকে আমন্ত্রণ করে? নারীর প্রকৃতি বুঝিবার জন্ত জীব-জগতের স্ত্রী-জীবের চরিত্র পর্যালোচনা করিলে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। জীবমাত্রেরই জীবন রক্ষার্থে আহার চায়



ও বংশ রক্ষার্থে শাবক উৎপাদন করে—এই ব্যবস্থার উপরই সৃষ্টিরক্ষা নির্ভর করে। অতএব আহার ও প্রজনন করার আকৃতি জীব মাত্রেই স্বাভাবিক চাহিদা। যে নিয়ম ও শৃঙ্খলায় জীব-জগতের এই আদিম স্বাভাবিক চাহিদার সূচু, মঙ্গলপ্রসূ ও সুনিয়ন্ত্রিত সমাধান আছে তাহাই আদর্শ নিয়ম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। আমরা দেখিতে পাই স্ত্রীজাতি মাতা হয়—সন্তানকে পালন-পোষণ করে, সন্তান বা পরকে কষ্ট করিয়াও পালনে-পোষণে বাড়াইয়া তুলিয়া সুখানুভূতি প্রথমে জাগে স্ত্রীজাতির মাতৃত্বে। স্ত্রী-জীব মাত্রেই যখন মাতা হয়—মাতৃত্বে সুখবোধ করে, তখন নারীদিগেরও মাতা হইবার প্রকৃতিগত প্রেরণা আছে—মাতৃত্বের ক্ষুধা আছে। তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজের উচিত তাহাদিগকে মাতা হইবার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া—মাতা হইতে হইলে যাহাতে তাহাদের কোন কষ্ট না হয় সেইরূপ বিধান করা। তাহাই হইবে নারীদিগের প্রকৃত মঙ্গল বিধান।

নারীদেহ পুরুষদেহ হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। নারীদিগের মাতৃত্বের উপযোগী অনেকগুলি অঙ্গ আছে। সেইগুলি নারীদেহের মুখ্য অঙ্গের মধ্যে গণ্য। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে মাতৃত্বের পরিপোষক অঙ্গগুলি সক্রিয় হয়। নারীচিত্তে তখন মাতৃত্বের ক্ষুধা জাগে। তখন যদি সেই অঙ্গগুলি ব্যবহৃত হইতে না পারে অর্থাৎ মাতৃত্বের ক্ষুধার আহার যদি তখন না মিলে তখন সেই অঙ্গগুলি ও তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ু ও রসগ্রন্থিগুলি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক ও বিকৃত হইয়া যায় এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাধি জন্মে। ইহা অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ স্বীকার করেন। বিখ্যাত মনীষী Havelock Ellis এই মাতৃত্বের সুখবোধকে—massive and



































চরিত্রের বা শিক্ষার যে অংশের দ্বারা বেশী প্রভাবান্বিত হইবেন অর্থাৎ স্বামীর যে-গুণকে তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ ভাবে স্বামীকে অনুরঞ্জিত করিতে পারিবেন, তদগুণ বিশিষ্ট সন্তানেরই তিনি জননী হইতে পারিবেন। স্বামীর চরিত্রের অন্যান্য গুণরাশি যাহা তিনি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না সেই সমস্ত গুণসম্পন্ন সন্তানও তিনি লাভ করিতে পারিবেন না। তাই যদি বহুগুণসম্পন্ন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকে তবে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন বহু সন্তান সমাজ লাভ করিতে সক্ষম হয়।

উদ্ভিদ জগতে আমরা দেখিতে পাই একটি স্মৃষ্টি ও উচ্চ জাতের আত্ম বৃক্ষের বিভিন্ন শাখার সহিত বহু নিকৃষ্ট জাতের আত্ম-চারার জোড় বাঁধিয়া আমরা বহু উৎকৃষ্ট ফলমের গাছ সৃষ্টি করিতে পারি। তদ্রূপ মনুষ্য-সমাজেও যদি উপযুক্ত পুরুষের বহু স্ত্রী শাস্ত্রসম্মতভাবে বিद्यমান থাকেন তাহা হইলে বহু উৎকৃষ্ট সন্তানই আমরা লাভ করিতে পারি। বহু বিবাহের স্বপক্ষে আর একটি বিবেচ্য বিষয় হইল—নারী যে-সময়ের মধ্যে একটি সন্তান প্রসব করিতে সমর্থ হয়—পুরুষ সাধারণতঃ সেই সময়ের মধ্যেই একাধিক সন্তানের জনক হইতে পারে।

“Every egg produced by a woman ( usually once a month ) carries the same type of sex chromosome”. —আবার পুরুষের বেলায় দেখা যায়—“The sperms are released in fantastically large numbers—up to a thousand million.” অর্থাৎ, নারীর ডিম্বকোষ সাধারণতঃ প্রতি মাসে একটি করিয়া সুপরিপুষ্ট ডিম্ব প্রদান করিতে সক্ষম, কিন্তু পুরুষ সেই সময়ের মধ্যেই লক্ষ কোটি শুক্রকীট উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং, স্বাস্থ্য-

বান, চরিত্রবান, আদর্শপরায়ণ, বিত্তশালী পুরুষ যদি তদুপযুক্ত একাধিক স্ত্রীতে ধর্মতঃ উপগত হয় তবে বহু উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম হইতে পারে। এইরূপে দেশ তথা জাতি বহুলাংশে উপকৃত হইয়া থাকে।

জন্ম-মৃত্যুর হার গণনা হইতে দেখা গিয়াছে, পুত্র-সন্তান অপেক্ষা কন্যা-সন্তানের সংখ্যাই অধিক—“Average prenatal mortality, male to female 127.5 to 100.” সুতরাং, যেখানে কন্যা-সন্তানের সংখ্যাই অধিক এবং কন্যা যদি সং ও উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিবার ইচ্ছাই থাকে তবে যেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বইচ্ছায় উপযুক্ত পাত্রে একাধিক স্ত্রী পরিণীতা হয় সেখানে বিরোধিতা না করিয়া সহায়তা ও উৎসাহ বর্ধন করাই সকলের কর্তব্য। কন্যাগণকে সেইরূপ ভাবেই শিক্ষিতা করা উচিত যাহাতে তাহারা উপযুক্ত সংপাত্র পাইলে সপত্নীকে স্বীকার করিয়া লইয়াও উক্ত পাত্রে সন্তুষ্ট চিত্তে, সাগ্রহে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধা হয়। তাহা না হইলে অনেক কুমারীকে হীন পাত্র মনোনয়ন করিতে হইবে অথবা কুমারী-জীবন যাপন করিতেই বাধ্য হইতে হইবে।

নারীর অন্তর্নিহিত ঐক্য মাতৃত্বে। মাতৃত্বই নারীর পূর্ণ বিকাশ। সে চায় উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী হইতে। শারীরিক ও মানসিক গঠনই তাহার মাতৃত্বের উপযোগী। উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী হইতে হইলে তাহার শিক্ষা, তাহার সংস্কৃতি এমন হওয়া দরকার, যাহাতে সে স্বভাবতঃই আদর্শপরায়ণ এবং সর্বোংশে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষকে পতিরূপে পাইবার সাধনা করিতে পারে,—আর নারীর সহজাত সংস্কার ও সহজ মাতৃবুদ্ধিই তাহাকে সর্বোংশে শ্রেষ্ঠ পুরুষকে পতিরূপে বরণ করিবার



প্রেরণা দেয়। তাই বার্নার্ড শ' বলিয়াছেন—“নারীর সহজ মাতৃবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ পুরুষের দশমাংশকে বরং শ্রেয় জ্ঞান করে—তৃতীয় শ্রেণীর একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে পুরোপুরি পাওয়া অপেক্ষা।” এদিক দিয়া বিবেচনা করিলে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের বহু স্ত্রী হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, “Men are over-sexed, they are by nature polygamous and promiscuous, while women are monogamous.” আবার, “A man may love a woman deeply and sincerely and at the same time make love to another woman or have sexual relations with her. It is quite a common thing with a man. It is quite a rare thing with woman.”—Dr. William J. Robins. কাজেই নারীর সহজ সংস্কারই হইতেছে একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা,—আর পুরুষের বহুবিবাহ স্বাভাবিক।

আবার, “Man's love is of man's life a thing apart. 'Tis woman's whole existence.”—অর্থাৎ, পুরুষের নারীর প্রতি ভালবাসা তাহার জীবন ও সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু নারীর স্বামীর প্রতি ভালবাসাই তাহার অস্তিত্ব। পুরুষ যদি আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে তবে বহু বিবাহ তাহার কমই ক্ষতি করিতে পারে। সমাজ চায় সুসন্তান। তাই শক্তিমান, যোগ্য পুরুষে সম্যক আকৃষ্টা জীগণ প্রায়ই সুসন্তানের জননী হইয়া থাকে।

লোক-তথ্য গণনায় দেখা গিয়াছে, বর্তমান সমাজে যাহারা যত অযোগ্য ও দুর্বলচিত্ত তাহাদের সন্তান সুস্থদেহ ব্যক্তির সন্তানের চেয়ে



শতকরা ৫০ হিসাবে বেশী। দুর্বলচিত্ততা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত দোষ। গ্যালটন প্রতিষ্ঠিত এই সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের লক্ষ্যই হইতেছে, সমাজ হইতে এই দোষের নিরাকরণ এবং যাহারা শরীর-মনের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা সুস্থ ও সক্ষম তাহাদের মধ্য হইতেই সন্তান জন্মান।

তাই আর্য্য ঋষিগণ সমাজের দিকে চাহিয়া যোগ্য পুরুষের বহু বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন, কেননা বহু বিবাহ দ্বারা সমাজের একটি মহৎ উপকার সাধিত হয় যে উৎকৃষ্ট কুমারীগণ স্বভাবতঃই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবে। তাই সমাজের ভিতর যাহারা নিকৃষ্ট পুরুষ তাহারা উৎকৃষ্ট স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে না। ফলে আর্য্য সমাজ-দেহই পুষ্ট লাভ করিবে; এবং যাহারা উৎকৃষ্ট নয়—তাহারা উৎকৃষ্টের পূজক হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিবে। কারণ, পুরুষ চায়—নারীর দ্বারা সম্বন্ধিত হইতে। উৎকৃষ্ট নারীর দ্বারা সম্বন্ধিত হইতে হইলে তাহাকেও উৎকৃষ্ট হইতে হইবে। আর, সমাজে যাহারা দুর্বল ও অযোগ্য পুরুষ, যথাসম্ভব তাহাদের বংশবৃদ্ধি নিবারিত হইবে। ইহাতে সমাজের প্রভূত মঙ্গলই সাধিত হইবে।

পুরুষত্বের সর্বাপেক্ষা বড় অবমাননা হইতেছে নারীকে বিবাহের জন্ত প্রস্তাব দেওয়া—কিন্তু নারী যদি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সশ্রদ্ধ আকৃতিতে কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে—আর সেই নারী যদি বর্ণে, বংশে ও চরিত্রে অর্থাৎ সর্বতোভাবে সেই পুরুষের গ্রহণীয়া হয়, তবে সেই নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাই পুরুষের ধর্ম্ম। সর্বপ্রকারে গ্রহণযোগ্য হইলেও যদি গ্রহণ করা না হয়, তবে নারী প্রায়শঃই উচ্ছ্রাল, বিকৃত ও সমাজঘাতিনী হইয়া থাকে—আর ঐ পুরুষই হয়



ইহার জন্ত দায়ী। অতএব এরূপ করা পুরুষের পক্ষে অধর্ম্য।

আর, নারী যদি স্বেচ্ছায় সর্বতোভাবে যোগ্যতা বিচার করিয়া কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে, আর সে যদি ঐ পুরুষের দশ-মাংশের একাংশেরও অধিকারিণী হয়, তবুও সে নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলিয়াই জ্ঞান করে। কারণ, স্বামী কথার অর্থ—‘আমার অস্তিত্ব’।

স্বামী—স্ব (Self আত্মা) + আমিন্ (অস্ত্যর্থ)। সুতরাং কোন মেয়ে যদি কোন পুরুষকে স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্বরূপেই গ্রহণ করে, আর তার সেই গ্রহণ করার মধ্যে যদি কোন ফাঁক না থাকে তবে সেই অস্তিত্বকে সে নিজ ক্ষমতানুযায়ী বাঁচা ও বাড়ার পথেই পরিচালিত করিবে,—ইহাই নারীর বৈশিষ্ট্য।

“নারী হইবে চিরসহনশীলা, চিরশুচী ও কল্যাণী—তার প্রজ্ঞা কখন ভুল করিতে জানে না—সহজ সংস্কারের মতই তা’। নারীর প্রজ্ঞা স্বার্থসাধনের জন্ত নয়—ত্যাগের জন্ত, তাঁর প্রজ্ঞা তাঁকে কখন স্বামীর উদ্ধে নিতে চায় না—স্বামীর পার্শ্বচারিণী সহধর্ম্মিণী করিতে চায়। নারীর প্রজ্ঞায় উগ্র স্বার্থান্ধ কামের সংকীর্ণতা নাই, আছে অসীম বৈচিত্র্যময়, অনুরাগভরা বিনয় ও সেবা-নয়নতা—নারীর পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্যের স্বরূপই এই।” —রাক্ষিন।

নারীর স্বরূপ এই। নারীর এই রূপ যেখানে বিকৃত হয় নাই—নারী যেখানে প্রকৃত শিক্ষিতা, নারী যেখানে ভালবাসার আধার-স্বরূপা, অর্থাৎ কামনাহীন ভালবাসাই যেখানে নারীর ধর্ম্ম—সে রূপ স্থলে আদর্শপরায়ণ যোগ্য পুরুষের বহু স্ত্রী থাকিলেও তাহাদের ভিতরে বিরোধ বা অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা কম থাকে। কারণ,



সতী নারীর বৈশিষ্ট্যই হইতেছে স্বামীকে অস্তিত্বপূর্ণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে সর্বতোভাবে অব্যাহত রাখা। এরূপ ক্ষেত্রে সমস্বার্থসম্পন্ন সপত্নী তাহার বিরাগভাগিনী না হইয়া সন্তোষদায়িনীই হইয়া থাকে। কারণ, উভয়েরই লক্ষ্য বস্তু এক এবং তাঁরই জীবন ও বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের গতিপথ সুনিয়ন্ত্রিত। আর, স্বামী যাহাদের স্বার্থের ক্রীড়নক, খেয়াল-ক্ষুধা পরিতৃপ্তির যন্ত্রমাত্র—ভাগীদার হইলে তাহাদের ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়ই। কারণ, স্বার্থের ব্যাঘাতেই বিরোধ, আর স্বার্থের পূরণেই মিলন—ইহাই জীবের প্রকৃতি। অতীত পতিকে তুষ্ট ও পুষ্ট করাই যাহাদের স্বার্থ, অংশীদারে তাহাদের আনন্দ ও ভালবাসাই স্বাভাবিক। মহাভারত রামায়ণে ইহার অনেক উদাহরণ বিদ্যমান। অবশ্য বহুবিবাহ যোগ্য পুরুষের জন্তই—সকলের জন্ত নহে।

কিন্তু যোগ্য পুরুষ আমরা কাহাকে বলিব? কোন্ পুরুষ বহু-বিবাহের উপযুক্ত? নারী-জাতির এইরূপ বিবাহে সম্মত হওয়া স্বাভাবিক, অথবা ইহা তাহাদের পক্ষে প্রাণান্তিক শাস্তিস্বরূপ। এই সমস্ত প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধানের উপরেই ইহার ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক নির্ভর করিতেছে। বহুবিবাহ নাম শুনিয়াই আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে আজ আধ্যাত্মিক এতই বিভ্রান্ত যে কিসে তাহাদের মঙ্গল, কিসে তাহাদের অমঙ্গল সে চিন্তা করিতেও তাহারা পরাজয়।

যাহা আমাদের সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, যে-বিধি আমাদের জাতীয় জীবনে মঙ্গলপ্রসূ—যাহা আমাদের সহজাত সংস্কারের দ্বারা



মজাগত, তাহাই আমাদের আধ্যাত্মিক আমাদের সমাজে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব—আমাদের কি ছিল আর আমরা কি হারাইতে চলিয়াছি!

এখনও, বহুবিবাহ কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে এবং কি-কি অবস্থায় সমর্থনযোগ্য তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। প্রকৃত পুরুষ নামের অধিকারী যিনি তিনি কখনও বিবাহের জন্ত লালায়িত হন না। বিবাহ তাহার জীবনে মুখ্য ব্যাপার নহে।

পুরুষ যেখানে আদর্শপরায়ণ—শৌর্য্যো, বীর্য্যো, বংশে চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, সামাজিক পরিস্থিতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বিদ্যমান—আর নারী যেখানে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে, সর্ব্বতোভাবে নিজেকে তদুপযুক্ত করিয়া গড়িয়া লইয়া সেই পুরুষত্বের পায়ে দ্বিধাশূন্য চিত্তে নিজের জীবনকে অর্ঘ্য দিয়া ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়, বহুবিবাহ সেখানেই সার্থক, আর সেরূপ ক্ষেত্রেই দেশ সুসন্তান আশা করিতে পারে। উন্নত স্ত্রী-পুরুষের মিলনের দ্বারাই দেশ উৎকৃষ্ট সন্তান লাভে সমর্থ হয়।

পুরুষ ছুটিবে তাহার আদর্শের পশ্চাতে—তাহার জাতীয় জীবনের পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে—আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারই প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করাতেই পুরুষের পুরুষত্ব। “Man’s power is active, progressive, defensive. He is eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender. His intellect is for speculation and invention, his energy for adventure for conquest.”—Ruskin.



















































































































































































অত্যাডাসিত পুরুষের নিকৃষ্ট সন্তান দেখিতে পাই। মাতার দায়িত্ব সম্বন্ধে নারীর সর্বতোভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সংসারে আনিয়া যদি সন্তানের প্রাণে আশান্তির আগুন, অশিক্ষার গ্লানি জ্বালিয়া দেওয়া হয়—তবে পিতামাতা নিজেদের কাছে তো অপরাধী হইবেনই, সমগ্র দেশের কাছেও তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন। কারণ, সুসন্তান যেমন মানব জীবনের তথা জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—কুসন্তান তেমনি সমাজ জীবনের কুংসিং ব্যাধি। এ সত্য প্রতিটি পিতামাতার সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

মানুষের কাছে মনুষ্যত্বই আশা করা যায়। সে তো আর বুদ্ধি-বিবেচনা শূন্য প্রবৃত্তি-পরিচালিত পশু নহে। স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া অগ্রপশ্চাৎ হিসাব করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা ভগবান তাহাকে পরিপূর্ণরূপেই দিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহার সংব্যবহার করিতে না পারার কোন কৈফিয়ৎই থাকা উচিত নহে।

প্রকৃত বিবাহ বলিতে যাহা বোঝায়, আর্য্য ভারতের সেই ঋষি-প্রবর্তিত পবিত্র বিবাহ-সংস্কারের ভিতর বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক গলদ প্রবেশ করিয়াছে। তাই বিবাহের দুইটি মূল উদ্দেশ্য 'উদ্ভিদন ও সুপ্রজনন' সমাজের প্রতিটি স্তরেই প্রায় ব্যাহত হইতেছে। উপযুক্ত বিবাহের অভাবে, তদুপরি উপযুক্তরূপ পরিবেশ সৃষ্টির অপার-গতায় ক্রমশঃই দেশে প্রকৃত মানুষের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সুসন্তান আর জন্মগ্রহণ করিতেছে না। দেশের আজ বড়ই দুর্দিন। চিন্তা করিবার বা বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

প্রায়শঃই আবার দেখা যায়, কষ্টের সংসারে বা অভাবের সংসারে



সন্তান-সংখ্যা অধিক হয়। আর স্বচ্ছল, লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত, শিক্ষিত পরিবারে সাধারণতঃ সন্তান-সংখ্যা কম। ইহার কারণ অতি স্পষ্ট। প্রথম ক্ষেত্রে মানসিক প্রসারতা, চিত্তের উদারতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের চাপে নষ্ট হইয়া যায়। তদুপরি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সহানুভূতিশীল অনুকম্পার অভাব, পরস্পরের ভিতর ভাবের আদান-প্রদানের অপ্রাচুর্য্য, অবসর সময়ে একে অত্মকে নির্দোষ অথচ তৃপ্তিপ্ৰদ সঙ্গদানে অপারগতা ইত্যাদি অনেক সময় অধিক সন্তানের জন্মের কারণ হয়। এবং পিতামাতার মানসিক অস্থিতার দরুণ এই সব সন্তান প্রায়শঃই সুসন্তানের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ, সুসন্তান পাইতে হইলে পিতামাতাকে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণরূপে সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী হইতে হয়; এই ব্যাপারে আরও অনেক দিক বিবেচনা করিবার আছে। কিন্তু এইটাই হইল গোড়ার কথা। সন্তান-ধারণের মুহূর্ত্তে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থার উপরই প্রধানতঃ সন্তানের জৈবী সংস্থিতি অনেকাংশে নির্ভর করে।

অপর ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সং ও উচ্চ-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত থাকিবার মত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। সেবা, সহানুভূতি ও পরিপূর্ণ দরদের সহিত একে অত্রের প্রিয়তম বন্ধুর মত পাশে-পাশে চলিতে পারে। আশায়, ভয়সায়, উৎসাহে ও উদ্দীপনায় পরস্পর পরস্পরের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করিতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর এই প্রকার সুস্থ মিলন ও মধুর নিঃশঙ্ক উপভোগের দ্বারা বর্তমান সময়ের এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও উভয়ের মিলিত জীবন শান্তি ও তৃপ্তিময় হইয়া উঠিবে নিশ্চয়।



অভ্যাস করিলে জগতে কিছুই অসম্ভব নয়। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি ও সংযমের অধিকারী। অনুশীলন করিলে তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যে-উপভোগের পিছনে মনস্তাপ ও অশান্তি বর্তমান, একটু প্রয়াস করিয়া তাহা হইতে যতদূর সম্ভব অব্যাহতি লাভ করা কি উচিত নয়? জনন-নিরোধ প্রয়োজনে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া অযথা দুশ্চিন্তা ও উদ्वেগে কাল কাটান, স্বাস্থ্য-বিকৃতি বরণ করিয়া লওয়া কিছুতেই সমীচীন নহে এবং তাহার প্রয়োজনও নাই।

আর এ ব্যাপারে পুরুষ অপেক্ষা নারীর ক্ষমতা অধিক। নারী শক্তিময়ী—মহাশক্তির অংশে তাহার জন্ম। সে যে ভাব ও অনুপ্রেরণা পুরুষের হৃদয়ে জাগাইয়া তোলে, পুরুষ সেই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কন্মক্ষেত্রে বাঁপাইয়া পড়ে। ইহাই চিরন্তন।

“কার্য্যেষু মদ্রী, করণেষু দাসী,

স্নেহেষু মাতা, ক্ষময়া ধরিত্রী।

শয়নেষু রামা, রঙ্গে সখী,

সা সীতা প্রিয়া মে।”

এই হইল নারীর সত্যিকারের সূক্ষ্ম রূপ। এই রকম সময়োপযোগী বিভিন্নরূপে নারী যদি তাহার পুরুষের পাশে দাঁড়াইতে পারে, তবে সমস্ত জগৎ তাহার চরণে, ‘মা আমার, জননী আমার’ বলিয়া ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। বাস্তব জগৎ হইয়া ওঠে স্বর্গ। দুঃখ, ক্লেশ, অশান্তি নারীর এই কল্যাণীকূপের স্পর্শে সুখ, শান্তি ও তৃপ্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে, জাতির এই ঘোর দুর্দিনে ওঠ নারী, জাগো মাতা, দশপ্রহর হস্তে অশুর বিনাশ করিয়া, অশিব নাশ করিয়া



আবার জগতে সত্য শিব সূন্দরের প্রতিষ্ঠা কর। স্বামী ও সন্তানের হাত ধরিয়া মাতৈঃ মস্ত্রে তাহাদিগকে সত্যের পথে—জ্ঞানের পথে—মঙ্গলের পথে পরিচালিত কর।

কারণ, নারীই জনন-নিয়ন্ত্রী। নারী বিবেচনা-প্রসূত বিধি বুদ্ধি অনুসরণে প্রয়োজন মত নিজেই জনন নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম। আবশ্যক হইলে, শারীর ও চিকিৎসাতত্ত্ব নির্দিষ্ট বিধি ও নিষিদ্ধ দিবসাদি লক্ষ্য করিয়া চলিলে নারী স্বয়ং প্রয়োজনমত সন্তান-জনন ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।



## নারী-জীবনে অর্থ-সমস্যা

বিংশ শতাব্দীর জীবন সমস্যা-সমাকীর্ণ। ঘরে-বাইরে বহুবিধ সমস্যায় বিংশ শতাব্দীর মানুষ জরাজীর্ণ। অর্থনৈতিক-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা-সমস্যা, বেকার-সমস্যা, বাস্তব-সমস্যা—নানাবিধ সমস্যার জালে উদ্ভ্রান্ত বর্তমান যুগের মানুষ। কোন দিকেই আলো দেখতে পায় না তারা। নিরাশার আধারে জীবন পরিপূর্ণ। হতাশায় নিম্গত প্রাণের প্রদীপ। উৎসাহ নাই, উদ্দীপনা নাই, নাই কোন প্রকার প্রাণের সমারোহ। আনন্দ-উৎসাহ নিভে গেছে জীবন থেকে। আকাশের আলো আর ইশারায় ডাকে না—বাতাসের বাঁশি আর কানে-কানে প্রীতির সুরা ঢালে না। সবই প্রাণহীন। সমুদয়ই বিবর্ণ। দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলা কেবল। কেবল কোন গতিকে বেঁচে থাকা। না মরে, ধুক-ধুক করে প্রাণটুকু জিইয়ে রাখা শুধু। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন সে-কথা। বেশী বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

স্ত্রী-পুরুষে মিলে সংসার। একে অতের পরিপূরক। দুইয়ে মিলে অথও এক। একজন কারণ, কার্য অগ্রজন। একজন প্রাণ, দেহ অপরে। ভেতর একজন, অগ্রজন বাহির। প্রাণ ও দেহ মিলে জীবনের কাজ অব্যাহত চলে। কার্য-কারণ অসংবদ্ধ হ'য়ে সাংসারিক গতির ছন্দপতন ঘটে না। নারী-পুরুষে মিলে জীবন-যাত্রা অবাধে নিক্ষেপ ক'রে চলে। জীবনসমুদ্র পাড়ি দেয় একে অতের সান্নিধ্যমধুর দখিনা বায়ের আনুকূল্যে। জীবন সহজ হয়, হয় স্বাভাবিক পরম্পরের



প্রেমসমৃদ্ধ সহযোগিতার দাক্ষিণ্যে। এই রকমই চলে আসছে সৃষ্টির আদি থেকে। কিন্তু এখন? এখন কি দেখতে পাই আমরা?

জীবনের রথ আর চলছে না যেন। একের পর আর সমস্তার উপলথণ্ডে ঠেকে রথের চাকা থেমে আসছে ধীরে। ক্রমাগত ঠোঁকর খেয়ে-খেয়ে হ'য়ে এসেছে জীর্ণ ভগ্ন। যে-কোন মুহূর্তে একে-বারেই ভেঙ্গে পড়তে পারে রথের চাকাটি। হয়ে উঠতে পারে জীবন পঙ্গু একেবারে। কিন্তু কী তার সমাধান? কী ক'রে রেহাই পাওয়া যেতে পারে সেই বিপর্যয়ের হাত থেকে? ভেবে দেখা উচিত, উচিত উপায় নির্দ্ধারণ করা। উচিত কায়মনোবাক্যে সেই উপায় মাফিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করা।

সকলের চাইতে বড় সমস্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। ভাত-কাপড়ের সমস্যা। অর্থাৎ বেঁচে থাকার সমস্যা। পেটে ভাত থাকলে, পরনে একটু নেকড়া জুটলে, মাথা গোঁজবার স্থান পেলে একটু মানুষের অভাববোধ বিশেষ কষ্ট দেয় না। মনের জোর অটুট থাকে তখন। বাইরের ঝড়-ঝাপটা আর কাহিল করতে পারে না তেমন। অত সব সমস্যাই তখন সমাধানযোগ্য বিবেচিত হয়। পেট ঠাণ্ডা থাকলে সবই ঠাণ্ডা মানুষের। মাথাও ঠাণ্ডা হ'য়ে জটিল বিষয় চিন্তা করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু বর্তমান যুগে মধ্যবিত্ত ঘরে কয়জনের থাকে পেট ঠাণ্ডা? কতজন উপযুক্তরূপে আহা-আশ্রয় পেয়ে সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার পায়? পারে সমাজের বুকে সুস্থ দেহ-মনে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াতে?



খুব কমই পারে। বিপুল জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশই আজ তৃপ্ত দেহে-মনে মানুষের অধিকার নিয়ে সমাজের বুকে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে সমর্থ হচ্ছে। আর অতেরা? তাদের অবস্থা কারুরই অগোচর নাই। দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে কেবল। চলেছে তব্বৎ জীবনভার ব'য়ে শেষ পরিণতি লক্ষ্য ক'রে অসহায়ভাবে।

এ অবস্থার জন্ত দায়ী কে? সে প্রশ্ন থাক। সে প্রশ্নে যেতে চাই না এখন। এই প্রকার জীবন-চলনার জন্ত কারা সর্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন, কাদের মুখের হাসি, প্রাণের খুশী মিলিয়ে যায়, জীবন হ'য়ে দাঁড়ায় নীরস মরুভূমি, এ সমস্ত সমাধানে কারা ঘরে-বাইরে দিশাহারা হ'য়ে উপায় নির্দ্ধারণে মরীচিকার পিছনে ছুটে ক্লান্ত হয়, সেই সম্বন্ধেই কিছু বলতে চেষ্টা করবো।

নারী গৃহলক্ষ্মী। লক্ষ্মী কথা এসেছে শ্রী অর্থাৎ সেবা করা থেকে। সেবা, সহানুভূতি আর অনাবিল সাহচর্যের দ্বারা গৃহের শ্রী সম্পাদন করেন যিনি, তিনিই গৃহলক্ষ্মী। নারীর সহজাত সংস্কারই হল গৃহকে সুন্দর, সুশ্রী ও স্বাস্থ্যকর ক'রে গ'ড়ে তোলা আর সেই পরিবেশে তার প্রিয়তম পতি-দেবতা ও তাঁর পরিজনবর্গ সহ আপন সন্তান-সন্ততির তুষ্টি ও পুষ্টিবিধান করা। নারী—(নারয়তি) অর্থাৎ যে বৃদ্ধি পাওয়ায়। প্রিয়-পরিজনদের বাঁচিয়ে রাখা ও বৃদ্ধি পাওয়ানোই নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। স্বামী নারীর অস্তিত্ব। নারীজীবনের সুখ ও শান্তির উৎস হলেন স্বামী। ভালবাসা নারীর জীবন। প্রেমহীন জীবন নারীর কাছে মরুভূমি। স্বামীপ্রেম নারীর প্রাণপ্রদীপ।



আবার, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সেতু হল সন্তান। স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনে সন্তান নিয়ে আসে বৈচিত্র্য। সন্তান নারী-জীবনে পরমসম্পদ। মাতৃহই নারীত্বের পরম ও চরম পরিণতি। মা হওয়ার জন্মই বিশেষ ক'রে নারীর জন্ম। নারীর দেহ-মনের প্রস্তুতিও তদনুপাতিক। বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টিরক্ষার আকাজক্ষা নারীর মাতৃরূপেই চরিতার্থতা লাভ করে। নারী ধাত্রী, নারী পালয়িত্রী, আবার নারীই মাতা—সন্তানের দেহ-মনের পরিমাপ সাধন করা নারীরই কৃতিত্ব। স্বামী ও সন্তান তাই নারী-জীবনের মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডে যখন ব্যাধি প্রবেশ করে নারী-জীবন তখন অচল হয়। সমস্ত আলো নিভে যায় নারীর দৃষ্টির সন্মুখ থেকে। অন্ধকারে দিশাহারা হয় নারী তখন। প্রাণপণে অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। আঁকু-পাকু পথ খুঁজে ফেরে। স্বামী-সন্তানের ছুঁখ কিছুতেই সইতে পারে না নারী। তাদের দুর্গতিতে প্রাণ তার দিশাহারা হয়। আকুল হ'য়ে নিরাকরণের উপায় খোঁজে। কিন্তু পায় কি? ছুঁখ কি তাতে কমে কিছু? স্বামী ও সন্তানের জীবন কি তাতে অনায়াস হয়? হয় কি কণ্টকশূন্য?

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে সন্তান উপযুক্ত শিক্ষা পায় না। পায় না একজন সত্যিকারের মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে উঠবার সুযোগ-সুবিধা। স্বামীর মুখে প্রয়োজনানুপাতিক পুষ্টিকর আহাৰ্য্য তুলে ধরতে পারে না স্ত্রী। উপযুক্ত আহাৰ ও বিশ্রামের অভাবে দেহ-মনের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেন স্বামী ধীরে-ধীরে চোখের ওপরে। নিরুপায়

(৮)



অক্ষমতায় কেবল চেয়ে-চেয়ে দেখা আর দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে চেপে রাখা ছাড়া কিছুই আর করবার থাকে না নারীর। সংসার হয় বিষাক্ত। জীবন হয় দুর্ব্বহ। হাতের কাছে অত্র কোন পথ খোলা না পেয়ে অর্থ-উপার্জন-উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে পথে বের হয় নারী। যায় চাকুরীর অন্বেষণে। নারীর মন নীড়-প্রয়াসী। নিরুদ্বেগ শান্তশ্রী-মণ্ডিত আত্মীয়-পরিজন-পরিবেষ্টিত গৃহের নিরাপদ আশ্রয় নারীর চিরকালের প্রিয় বস্তু—আকাজ্জার সামগ্রী। সর্ব্বসুখমার আধার, অভাব-অভিযোগবর্জিত একখানি নীড়ের পরিকল্পনা তার আবাল্যের সাধনা। তার পুতুল-খেলার জীবনের স্বপ্ন। তার বিলাসিতা নয়—তার অস্তিত্বের প্রয়োজন।

সেই গৃহ নারী ছাড়তে বাধ্য হয় অনেক দুঃখে। অনেক অভাব-অভিযোগের পীড়নে নারী তার গৃহ ছেড়ে পথে পা দিতে বাধ্য হয়। দেহ-মন কিছুই তার এ কার্য্যে সাহায্য দেয় না প্রথমে। কষ্টসাধ্য হয় তার চাকুরীর জীবন। তবুও উপায় থাকে না তার। অর্থ-উপার্জনের ধাক্কায় পথে তাকে বের হতে হয় বিংশ শতাব্দীর এই অর্থনৈতিক দুর্দিনের কালে। গৃহের অবস্থা একটু স্বচ্ছল করবার আকাজ্জায় নারীকে বের হতে হয় চাকুরীর খোঁজে। স্বামী ও সন্তানের দেহ-মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবার জন্ত করতে হয় তাকে অর্থ-উপার্জন। অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানের জন্ত গৃহের বাহিরে কালযাপন করতে হয় তাকে দীর্ঘ সময়ের জন্ত।

কিন্তু সমস্যা কি তাতে সমাধান হয় কিছু? অভাব-অভিযোগ কি ঘোচে কিছু সংসারের? স্বামী-সন্তানের স্বাস্থ্য কি ফেরে তাতে?



আনন্দ কি ফিরে আসে সংসার-জীবনে আবার? হয় দুঃখকষ্টের অব-  
সান? আলোচনা ক'রে দেখা যাক একটু।

কুমারী মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইছি না এখন। ভবি-  
ষ্যতে এ বিষয়ে একটু আলোচনা ক'রে দেখা যাবে। যে মেয়েরা  
সখ ক'রে, কিম্বা ঐভাবে সময় কাটাবার জন্ত ইচ্ছা ক'রে প্রয়োজন  
তৈরী ক'রে নিয়ে চাকুরী ক'রে বেড়ায়, তাদের বিষয়ও এ প্রবন্ধের  
আলোচ্য নয়। যারা জননী এবং গৃহিণী, যারা বাধ্য হয়ে স্বামী-সন্তানের  
সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্ত অর্থ-উপার্জনে গৃহ ছাড়তে বাধ্য হন, তাঁদের কথাই  
একটু আলোচনা করবো আমি। দেখবো বাড়তি অর্থ-উপার্জন ক'রে  
সংসারের দুঃখ তাঁরা কতটা লাঘব করতে পারেন।

গৃহিণীকে কাজে বের হতে হয়। থাকতে হয় দীর্ঘ সময়ের জন্ত  
সংসার থেকে অনুপস্থিত। স্বামী-সন্তানের সেবা-যত্ন, সংসারের বিলি-  
ব্যবস্থা কিছুই ঠিক মতন ক'রে উঠতে পারেন না, একমাত্র ছুটির দিনটিতে  
ছাড়া। একলা মানুষ ঘরে-বাইরে কোন দিকে সামলাবেন? তাছাড়া  
নিজেরও শারীরিক ক্লান্তি একটা থাকতে পারে। বাইরের কর্তব্য  
যথাযথ পালন করে এসে ঘরের দিকেও যথোচিত মনোযোগ দেওয়া  
সম্ভব কম—একটা মানুষের পক্ষে। সংসারের পানে তাই ঠিকমত মনঃ-  
সংযোগ করা হয়ে ওঠে না গৃহিণীর। সংসারের ভার বাধ্য হ'য়ে গুলত  
করতে হয় তৃতীয় কোন ব্যক্তির হাতে। সম্পর্ক আছে এমন কোন  
আত্মীয়া পাওয়া যায় তো ভাল, নইলে মাইনে করা দাসী-চাকরের হাতেই  
সংসারের ভার ছেড়ে রাখতে হয়। একটা মোটা টাকা বেরিয়ে যায়  
কাজের লোকের মাহিনা বাবদ অথবা তাদের ভরণ-পোষণের খরচা



ইত্যাদিতে। আর, স্বামী-পুত্রের দায়িত্ব বাইরের লোকের হাতে ছেড়ে রেখেই খুশী থাকবার চেষ্টা করতে হয় গৃহিণীকে।

কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে অগ্নের সংসারের প্রতি উপযুক্ত দরদ থাকা স্বাভাবিক নয়। তা' আশা করতে যাওয়াও নির্বুদ্ধিতা। একের সংসারের শ্রীবুদ্ধিতে অগ্নের কি স্বার্থ? নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের স্পৃহা হবেই বা কেন সকলের এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক যুগে? যন্ত্রে তেল ঢাল, যন্ত্র চলবে, নইলে অচল। এ-যুগে মানুষের হৃদয় নিয়ে মাতামাতির যুগ নয়। এখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষায়ই হিম-সিম খায় মানুষ। তাই অপরের নিকট থেকে আপনার জনের মত দরদ ও সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা আশা করাই বাতুলতা। নিজের সংসারে মানুষ বুঝে খরচ করতে পারে। যেমন আয় তেমন ব্যয় করেন গৃহিণী আপনার সংসারে। জিনিষের অপচয় বা হারান-ভান্ডার ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম গৃহিণীর চোখের উপর। অল্প জিনিষের সঙ্গে দরদ যোগ হয়ে গৃহের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়তা করে। দেহমনের দু্যতি পরিম্লান হতে দেয় না।

কিন্তু গৃহিণী যে-সংসারে দীর্ঘ সময়ের জগ্নু অনুপস্থিত, গৃহের কর্তৃত্ব তৃতীয় কোন ব্যক্তির হাতে, সে-সংসারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ কিঞ্চিৎ বেশীই হবে ধারণা করা যায়। গৃহিণী বাড়তি অর্থ উপার্জন করে, আনলেও, বাড়তি খরচ কিছুতেই তিনি রোধ করতে পারবেন না। আর, সারাদিনের পর বাড়ী ফিরে এ ব্যাপারটি লক্ষ্য ক'রে মনে তিনি আনন্দও পাবেন না মোটেই। বাড়তি অর্থ নিয়ে আসবে তাঁর মানসিক অশান্তি। দ্বিতীয়তঃ, সারাদিনের কর্মকলাস্তির পর সন্ধ্যাবেলা



বাড়ী ফিরবেন স্বামী। কার কাছে বসে শান্তি দূর করবেন তিনি? কার হাতের একটু প্রীতিমধুর সেবার পরশ পাবেন? কে দূর করবে তাঁর মনের আঁধার—প্রেম-প্রফুল্ল নয়ন-প্রদীপের আরতি শিখায়?

সে কি তাঁর উপার্জন-শ্রান্ত প্রেয়সীর বিষাদ-ক্ষিণ অবসন্ন অবয়ব? সারা দিনের ক্লান্ত স্ত্রী পারবে কি এমনি ক'রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রীতির বাঁধন অটুট রাখতে? গৃহের প্রতি আকর্ষণ কি বজায় থাকবে স্বামীর দীর্ঘদিন? হোটেল-রেষ্টুরেন্টের খাবারের চাইতে অপরের হাতের রান্নাকরা আহাৰ্য্য কি তাঁর কাছে অধিক সুস্বাদু বোধ হবে? একখানি প্রণয়মধুর আর প্রতীক্ষাব্যাকুল দৃষ্টি-প্রদীপের আকর্ষণ ছাড়াও গৃহের পানে মন কি স্বামীর ছুটে আসতে চাইবে আর? এ ব্যাপারটিও বিশেষ ক'রে ভেবে দেখবার জিনিষ। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমে আকর্ষণই যদি না রইলো—মনের বন্ধন যদি শিথিল হ'ল দিনের পর দিন—তবে আর রইলো কি সংসারের? দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য্য কোথায়? টাকা কি শান্তি দিতে পারে?

তৃতীয়তঃ, বাইরে যাতায়াতেরও একটা খরচ আছে আলাদা। উপযুক্ত বেশভূষা নইলে বাইরের সমাজে মান বজায় রাখা চলে না। আর, নিত্য-নতুন ফ্যাসানের যুগে নিজেকেও তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। দশজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে হ'লে মাঝে-মধ্যে সহকর্মীদের আদর-আপ্যায়নও করতে হয় পয়সা খরচ করে। ভদ্র ও সামাজিকতার সুনাম বজায় রাখতে হ'লে, চাকুরীতে উন্নতি করতে চাইলে, সহকারীদের খুশী রাখতেই হবে। যে-সমাজে মিশতে হবে তেমনি ক'রেই ঢেলে সাজতে হবে নিজেকে। তবে তো উন্নতির সম্ভা-



বনা সে-রাস্তায়? যে-টাকাটা সাংসারিক অনেক কিছু সুখ-শান্তি  
ত্যাগের মূল্যে ক্রয় করা হয়, কতটা আর তার অবশিষ্ট থাকে? এতোটা  
কষ্টসাধ্য বাড়তি পরিশ্রমের মজুরী পোষায়?

চতুর্থতঃ এবং মুখ্যতঃ, মাতার অনুপস্থিতিতে গৃহে সন্তান-সন্ততির  
অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায় সেইটাই বিশেষ করে দ্রষ্টব্য। সন্তানের  
জন্মই সংসার। বাচ্চার জন্মই নীড় রচনা। নইলে প্রেমিক-প্রেমিকার  
জন্ম সংসারের বন্ধ গণ্ডির প্রয়োজন হয় না। হৃদয়ে প্রেম থাকলে—  
চক্ষুতে প্রীতির আলো জ্বললে অন্ধকার সূড়ঙ্গের অভ্যন্তরেও তারা  
দীপালি আলোর উৎসব প্রত্যক্ষ করে। দীপাবলিশোভিত সুরম্য অট্টা-  
লিকা নইলেও জীবনযাত্রা তাদের থমকে দাঁড়ায় না।

তাই সন্তানের জন্মই গৃহের প্রয়োজন। আর, সন্তান-সন্ততির  
দেহ-মনের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনেই সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ গৃহপরিবেশ দরকার  
দরকার পিতামাতার প্রীতিমাখান নিবিড় সান্নিধ্য।

পিতা বাইরের কাজে ব্যাপ্ত—মাতাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ  
করেন, সন্তানের জীবন সেখানে কিভাবে কাটে? কার আদর-যত্নে,  
স্নেহ-মমতায় সে দেহ-মনের পুষ্টি পায়? সেটা কি পেতে পারে নিঃ-  
সম্পর্কীয় মাইনে-করা দাসী-চাকরের নিকট? না সে-পাওয়ায় তাদের  
দেহ-মনের ক্ষুধা মেটে? জীবন পুষ্টি পায়? কাজেই সেই ক্ষুধার পরি-  
তৃপ্তির জন্মই তাদের বাইরের ছনিয়া হাতড়ে ফিরতে হয়। মিশতে  
হয় বাইরের সব অবাঞ্ছিত লোকের সংসর্গে। আর, সেই তাদের  
অশিক্ষিত ও রুগ্ন সাহচর্যে ধীরে-ধীরে বালক-বালিকাগণ একটা অপরিচ্ছন্ন  
ও ব্যাধি-পরিপূর্ণ জগতে প্রবেশ করে। ধীরে-ধীরে গৃহ, সমাজ ও



জাতির দেহ অশুচি-সংক্রমণে বিষাক্ত করে তোলে। এর বহুসংখ্যক নজীর মেলে শিশু-অপরাধীদের রোজ-নামচা পর্যালোচনা করলে। স্নেহ-মমতা জড়ানো শান্তিপূর্ণ গৃহের স্নিগ্ধ পরিবেশের অভাবেই কত জীবন যে অকালে ছুঁই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আর সমাজ ও সংসারের পক্ষে সেটা যে কতদূর অপূরণীয় ক্ষতি তা' বলে শেষ করা যায় না।

সুসন্তান মানবজীবনের পরম সম্পদ। নারী-জীবন-বৃক্ষের অমৃত ফল সুসন্তানরূপেই ঝরে পড়ে। মহাপুরুষের জননী হওয়ার গৌরব নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। মহান্ শান্তি তার শ্রেষ্ঠ সন্তানলাভে। বাহিরের দুনিয়ার দাবী মেটাতে গিয়ে যদি সন্তানের প্রাণের দাবী উপেক্ষা করে নারী—আর তারই ফলে সন্তান যদি বিপথগামী হয়—আসে যদি সন্তানের জীবনে অমানিশার কালো মেঘ ঘনিয়ে—সে আঁধারে কি আলো ফুটেবে আবার জননীগণের সাংসারিক অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে স্বদৃঢ় করবার চেষ্টায়? সংসার সচ্ছল হলেই কি মনের শান্তি পাওয়া যাবে? আসবে জীবনের সার্থকতা সেই পথে? দেশ হবে উন্নীত ভবিষ্যৎ বংশধরগণের চারিত্রিক মহিমায়?

ভেবে দেখবার সময় এসেছে।



## শিক্ষিকা

মা—মাগো-ও মা-মণি—শিগগীর খেতে দাও। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে—হুন্দাম্ ক'রে বাড়ী ঢুকলো মণি। ঘরের ভেতর দৌড়ে এলো। বই খাতা বগলে, রুম্ব চুলের রাশি কপাল ঢেকে ফেলেছে, মুখের এখানে-সেখানে কালির দাগ। হাফ-প্যাণ্টের পেছন দিকে খানিকটা ছিঁড়ে গেছে—হাঁটু অবধি ধূলো মাখা, শ্রাণ্ডেল ফটফটিয়ে সোজা চ'লে এলো ঘরের ভেতর।

ওমা—মা, হাঁক দিলো আরও জোরে। চাইলো এদিক-সেদিক। হাতের বইপত্র ছুঁড়ে দিলো খাটের উপর। ঘরে দাপাদাপির শব্দ পেয়ে রান্না-ঘর থেকে মানদা বেরিয়ে এলো। হলুদের হাত কাপড়ে মুছতে-মুছতে এলো এগিয়ে, বললো—ওমা, তুমি এসেছো দাদাবাবু? ইস্কুলের ছুটি হ'য়ে গেল? গলার স্বর একটু নামিয়ে, স্বরে আদর ঢেলে বললো আবার—তবে এসো দাদা, হাত-মুখ ধুয়ে নাও, এসো খেতে দেই। দেখবে এসো ফুলো-ফুলো কেমন লুচি ভেজেছি, খোকার পায়ের দিকে নজর পড়তেই মানদার স্বর কঠিন হ'য়ে উঠলো—ঐ দেখ, আবার তুমি জুতো পায় শোবার ঘরে ঢুকছো? দিলে তো ঘরদোর আবার নোংরা করে? দাঁড়াও, মা আন্তন, আজ আবার আমি বলে দেব। কী ছেলে বাবা। সেদিন অত বকুনি খেলে—তাও হুঁস থাকে না? কী যে বাড়ীর ধরণ—মানদা গজগজ ক'রে উঠলো।

রুখে দাঁড়ালো মণি। চোখমুখ লাল ক'রে বললো—বেশ করবো। যা, বলগে যা মার কাছে। আমার বয়েই গেল। নালশে পোকা



কোথাকার। ভাগ, খাবো না আমি তোর হাতে। কিছুতেই খাবো না আমি তোর হাতে। কিছুতেই খাবো না। মা এলে তখন—ছুটে আবার বেরিয়ে গেল মণি ঘর থেকে। পেছনে ছুটে এলো মানদা—ও থোকা বাবু শোনো শোনো, যেও না—থেয়ে যাও। মার আজ ফিরতে দেবী হবে। ইস্কুলে কিসের মিটিং আছে আজ। চৈঁচাতে-চৈঁচাতে সদর দরজা পর্যন্ত বেড়িয়ে এলো মানদা। মণি ততক্ষণে চল গেছে দৃষ্টির বাইরে। সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মানদা আবার ফিরে এলো রান্না ঘরে। হেঁসেলের গোড়ায় বসে কাজে মন দিলো। বাবু পাচটায় ফিরবেন। তাড়াতাড়ি কড়াতে খুন্তি চালাতে লাগলো মানদা আর মুখে বকবক ক'রে চললো—কী জানি বাবা কেমন বাড়ী। সবই যেন খাপছাড়া। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কাজের চেষ্টায় এসেছিলাম, পড়েছিলাম নিঃবাক্য ট বাড়ী। একটি ছোট সংসারের দায়িত্ব নিয়ে থাকতে হবে নিজের লোকের মত। নিজের ভাবনা ভাবতে হবে না কিছু। সবই তারা বহন করবেন। খাওয়া-পড়া, ভাল হাত-খরচা। দেখা করতেই কাজও জুটে গেল।

সংসার ছোটই। ছোট ছেলে-মেয়ে আর কৰ্ত্তা-গিন্নী। ছোট হ'লে কি হবে। সবই যেন কেমন এলোমেলো, খাপছাড়া। সংসারে বান্ধন নাই কোন। যার-যার মতন সে-সে। কারুর সঙ্গে যোগ নাই যেন—নাই প্রাণের একটা আদান-প্রদান। গিন্নী,—যে সংসারের হাল ধরবে, সেই রইলো সারাদিন বাইরে-বাইরে। কৰ্ত্তা রইলেন তাঁর অফিস-কাছারী নিয়ে—তার ছেলেমেয়ে ছুটি যেন উড়ুন চড়ুই। যা মনে আসছে, তাই করছে, তাই করছে—ঐ যাঃ ডালে



বুঝি পোড়া লাগলো। আটার ডেলাটা দূরে সরিয়ে রেখে, মানদা ধপ্ করে ডালের হাঁড়িটা উলুন্ থেকে নামিয়ে ফেললো। ততক্ষণে পোড়া গন্ধে বাড়ী ছেয়ে গেছে। আজ গিনীমা রুটীর সঙ্গে ছোলার ডাল করতে বলেছিলেন—গেল তো ডালটা ছাই হ'য়ে!—পারি না বাবু, যার সংসার সে একটিবার চোখ তুলে চাইবে না, যত দায় হয়েছে আমার—কাজ করতে এসেছি বলেই কি চুরির দায়ে ধরা পড়েছি নাকি? আমাকেই পোহাতে হবে সব? ভাল লাগে না ছাই!

হাঁড়ির তলা টাচতে লাগলো আর আপন মনে বকবক ক'রে চললো—পাকিস্থান হ'য়ে নিজের ঘর-সংসার কোথায় ভেসে গেল ঠিক নাই; ছোটো টাকার জুতা এখন ভূতের ব্যাগার খেটে খাবো। ছড়-ছড় করে ডালের হাঁড়ি উপর করলো মানদা নর্দমায়; —এ ডাল আমি কর্তার পাতে দিতে পারবো না বাপু, যে রাগী মানুষ, হয়তো গায়েই ছুঁড়ে মারবেন বাটি শুক্ণ। তাক থেকে মুগের ডালের কোটা পাড়লো,—দেই আবার ছুটি মুগের ডাল চড়িয়ে, গিনীমা শুধালে যা হোক একটা-কিছু বললেই হবে—আবার ডাল চড়ালো মানদা। বস্লে গিয়ে রুটি বেলতে—মাস চালাতে হবে এই সব ভাঁড়ারের জিনিষপত্রে, যাক্গে কর্তার মেজাজ বুঝে আরও কিছু আনিয়ে নিলেই চলবে। গিনীমা তো আর জানতে পারছেন না—কর্তা-গিনীতে তো কথাই নেই একরকম, যে যার কাজে ব্যস্ত, খাওয়া-ঘুমোনের সময়টি ছাড়া বাড়ীতে থাকেনই না কেউ বড় একটা। রুটি তাওয়ার উপর ফেলে বললো আবার—আমার কিরে বাপু? পরের সংসার, অত দেখতে গেলে আর গতির বাঁচে না, আমার হলো গিয়ে মাইনে পাওয়া নিয়ে কথা।



আটার গাদাতে মানদা জল মাখাতে বস্লে।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন। পশ্চিম আকাশ আবীররাজা। নীলাশ্বরী সাড়ীর আঁচলে ধরনী দেহ আবৃত করছেন ধীরে-ধীরে। গলায় ছলে রয়েছে তাঁর দুগ্ধ-শুল একগাছি বলাকার হার! কণ্ঠহারের হীরামুক্তার দ্যুতি প্রতিফলিত হয়েছে জোনাকী পোকার চোখের তারায়—গৃহস্থঘরের প্রদীপ-শিখায়। সীমন্তিনী সন্ধ্যারানী জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আবিভূতা হচ্ছেন ধীর পাদবিক্ষেপে সন্ধ্যার আলো-আধারিতে গা ঢেকে দশ-এগার বছরের একটি মেয়ে টালুমানু চাইতে-চাইতে চোঁধুরী বাড়ীর সদর ঠেলে বাড়ী চুক্লে। এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে নিয়ে সন্তর্পণে মেয়েটি বারান্দায় উঠে এলো। লাল একটি ফ্রক পরা, খাটো চুলগুলি ঘাড়ে জুলছে, বড়-বড় চোখ দুটিতে সম্ভ্রান্ত দৃষ্টি, সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। পিঠ থেকে বই-খাতার ব্যাগটি বারান্দায় নামিয়ে রেখে রান্নাঘরে এসে উকি দিলো মেয়েটি—মানুদি, মা ফেরেননি?

মানদা রান্না সেরে হেঁসেল গুছাচ্ছিলো। ভাঁড়ারের জিনিষপত্র তুলে রাখছিলো একে-একে। গলার স্বর শুনে পেছন ফিরে চাইলো—তবু ভাল যে মেয়ের এতোক্ষণে ফেরার সময় হ'ল—অপ্রসন্ন স্বরে বলে উঠলো মানদা—আজ তো শনিবার, ইস্কুলের ছুটি হয়েছে সেই দেড়টায়—এতোক্ষণ থাকা হয়েছিল কোথায় গুনি? মানদা আঁচলে হাতখানি মুছে সামনে এসে দাঁড়ালো।

কণু এদিক-ওদিক চেয়ে চাপা স্বরে বললো—মা ফেরেননি মানুদি? মানদার স্বরে উষ্ণতা ফুটলো—সেই তো মজা হয়েছে



তোমাদের, যা ইচ্ছা যায় তাই করতে পারছো। মা থাকেন না সারাটি দিন বাড়ী,—ইস্কুলের ঝামেলা সামলাতে ব্যস্ত, আর তাঁর সংসারের সব ঝামেলা সামলাতে হবে এই আমাকে। সারাদিন পর বাড়ী ফিরে কৈফিয়ৎ তলব করবেন আমার কাছে। আর তোমরা যা' খুশী করে বেড়াবে চোপ্পর দিন। ছুটি হয়েছে সেই কখন, এতোক্ষণ বাদে বাড়ী ফেরার সময় হলো মেয়ের। যা' খুশী করো গো বাপু, মা বাড়ী ফিরলে সব কথা বলে দেব আমি আজ—গজ-গজ করতে-করতে মানদা ঘরের ভেতর পা বাড়ালো।

রুণু আগ বাড়িয়ে এসে ধরলো তাকে—অ মানুষি, শোনোই না—এই দেখ তোমার জন্ম কি এনেছি আজ, এক প্যাকেট চানাচুর গুঁজে দিলো রুণু মানদার হাতে। তারপর মানদার ঈষৎ খুশী-ভরা মুখের দিকে চেয়ে চোখ বড়-বড় করে বললো—জানো মানুষি, আজ ইস্কুলের ছুটির পর লীলা, বীণা ওরা সব সিনেমায় গেল, আমাকেও ধরে নিয়ে গেল তাই। কিছুতেই যাব না আমি, মা বকবেন বললুম, কিছুতেই ছাড়লে না, জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেল। লক্ষ্মীটি ভাই, মা এলে বলো না যেন, আবার সেদিনকার মতন মারবেন তা'হলে—মিনতি-ভরা চোখে রুণু মানদার মুখের দিকে চাইলো—হাতখানা ধরলো থপ্ করে।

হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে মানদা। গম্ভীর মুখে বললো—হ্যাঁ, তোমাকে সবাই রোজ-রোজ জোর করে সিনেমায় নিয়ে যায়, সবাইকার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই কিনা, আর মায়ের হাত ব্যাগ থেকে প্রায়ই পয়সাকড়ির গোলমাল হয়—তোমরা ভাই-



বোনে তার কিছুটা জানো না। আর মা আমার দিকে কী রকম করে তাকান। আমি কচি খুকী কিনা, বুঝি না কিছুই—কাজ নেই বাপু আমার এমন চাকরী করে—আসছে মাসেই আমি এ কাজ ছেড়ে দেব, গভর খাটিয়ে খাব, তার আবার—গজর-গজর করতে-করতে মানদা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দ্রুত হাতে খাটের বিছানা পাততে আরম্ভ করলো।

রুণু বই-খাতা পড়ার টেবিলে গুছিয়ে রেখে শোবার ঘরে ফিরে এলো, মানদাকে তোষক পাতায় সাহায্য করতে-করতে বললো—খেতে দেবে না মানুষদি—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে। সেই কখন দুটি খেয়ে গেছি বলো তো? মানদা ফিক্ করে হেসে ফেললো—খাওয়ার দরকার হয় তাহলে?—ভাইটি তো না খেয়েই ছুটে পালালো।—ও, খোকা খায়নি এখনও?—ব্যস্ত স্বরে বলে উঠলো রুণু। ঐ তো মিভিরদের উঠোনে গুলি খেলছে দেখে এলাম। মানদা বললো—যাও তবে, তাকেও ডেকে নিয়ে এসো—আমি ততক্ষণ খাবার গুছাই—মা এসে না হলে বকাবকি করবেন আবার। হ্যাঁ যাই খোকাকে ডেকেই নিয়ে আসি—তুমি খাবার ঠিক করো। রুণু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হ'য়ে গেল। আর মানদা গিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে।

বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ। সভা বসেছে। সাংস্কৃতিক সভা। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছেন সভায়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ একজন সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। গলায় ফুলের মালা হুলিয়ে একখানি বড় চেয়ারের ওপর তিনি বসে রয়েছেন। স্কুলের একটি ছাত্রী তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছে। বহু ছাত্রী এবং



অভিভাবক, অভিভাবিকাগণ সভাস্থল জুড়ে বসে রয়েছেন। আলোক-সজ্জায় সভামণ্ডপ ঝলমল করছে। একজন ছাত্রী মঞ্চের ওপর ব'সে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলো। তারপর সভাপতির পাশে এসে দাঁড়ানেন নীলিমা দেবী—স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তিনি সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের পর গম্ভীর কণ্ঠে-শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

তাঁর বক্তব্যের প্রধান বিষয় হ'ল ছাত্র-জীবনের কর্তব্য। কি করে ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষার মাধ্যমে তাদের নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন ক'রে সমাজ তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে, নীলিমা দেবী তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় তাই ব্যাখ্যা ক'রে চললেন। কেন আজ বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীগণ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অত্র প্রদেশের ছাত্রগণের সমকক্ষতা অথবা তাদের থেকে উৎকর্ষতার প্রমাণ দিতে পারছে না? কেন আজ তারা অনেক বিষয়েই এরূপ পশ্চাৎ অপসরণশীল? কেন আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমুদায় পরীক্ষাগুলিতেই এতো অকৃতকার্যতার আধিক্য? এর জন্ত দায়ী কি কেবল ছাত্রগণের মেধা বা ধী-শক্তির খর্বতা অথবা তাদের অন্তর্মুখিতা পরিহার করে বহির্মুখিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলা?

তিনি বললেন—বহির্জগতের আমোদ-প্রমোদে অধিক সময় মেতে থাকা এবং অভিভাবকগণের সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা বা প্রতিরোধ করতে অক্ষমতাই আধুনিককালে ছাত্রজগতের এইরূপ বিপর্যয়ের জন্ত অধিক দায়ী। তাই এ-দিকটা ভাল ক'রে ভেবে দেখতে এবং



সে-বিষয়ে অভিভাবকগণকে অবহিত হ'য়ে প্রতিকার-তৎপর হবার জ্ঞে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন নীলিমা দেবী।

আরও বললেন তিনি—বিশেষ ক'রে মায়েদের এ-বিষয়ে অবহিত হওয়া সর্বোপযোগী প্রয়োজন। জননীর সমস্ত পরিচর্যা ওপরই শিশুর দেহ-মনের স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। মাতার স্নেহ অনুশাসনে শিশুজীবন পরিচালিত হ'লে তাহা অতি অল্পক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। মাতৃস্নেহ-পুষ্ট শিশু কদাচিৎ বিপথগামী হয়েছে শোনা যায়। জননীর চোখের দৃষ্টি-প্রদীপের আলোয় সে তার গন্তব্যপথ ঠিকই চিনে নিতে পারে। কল্যাণদ্যুতি বিচ্ছুরিত মাতৃনয়নই শিশু-জীবনের প্রবতারা। তাই জাতির ভবিষ্যৎ আশাস্তুল শিশুদিগের দিকে সর্বোপযোগী সক্রিয় দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেক নর-নারীর, বিশেষ ক'রে মহিলাদের, অবশ্য কর্তব্য। এ কাজ জননী ছাড়া অত্র কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। আপন হাতে সন্তান-পরিচর্যা জননী-জীবনের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। অত্যাধিক অন্ততাপই জীবনের পাথেয় হয়।

নীলিমা দেবী তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। করতালিতে সভাপ্রাঙ্গণ মুখরিত হোল। তারপর একে-একে অত্রাশ্র শিষ্কয়িত্রীরাও এই বিষয়ের ওপর কিছু-কিছু বললেন। সভাপতির ভাষণের শেষে সভা ভঙ্গ হোল। নীলিমা দেবী বাড়ীতে ফিরলেন। সন্ধ্যা তখন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

বাড়ীর সদর দরজা ভেজান ছিল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন নীলিমা দেবী। ক্লান্তিতে পা দু'টো ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। শরীর অবসন্ন। মাথাটাও ধরেছে বেশ। সেই-কোন সকালে দুটি



হাতে-ভাতে ক'রে বেরিয়েছিলেন। ক্ষিদেয় পেট জ্বালা করছে এখন। অত সকালে কীই বা এমন রান্না হয় যে পেট ভরে থাকেন, নটার মধ্যে স্থলে বেরোতে হয়। বাসে করে অতদূর ঠিক দশটায় না হ'লে পৌঁছানো যায় না। তাই সকালে উঠে চায়ের পাট সেয়ে ডাল-ভাত নিজেকেই চড়িয়ে দিতে হয়। মানদা তো আসে সেই কত বেলায়—আটটার পরে। অত করে বলে-বলেও ওর সঙ্গে আর পারা গেল না। কিছুতেই একটু সকাল করে আসবে না ও। সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে নীলিমা দেবীর বুক থেকে। ভাল লোক আর পাওয়াই বা যায় কোথায়? সবই তো দেখা যায় অমনি। ছেলেমেয়ে দুটি ও স্বামীর কথা মনে জাগে। নিজে তো যাহোক ডাল-ভাত দুটি মুখে গুঁজে ছোটেন। ছেলেমেয়ে দুটো আর উনি যে কি খান, এক ছুটির দিনটি ছাড়া দেখবারও ফুরসুৎ হয় না। কী যে অসোয়াস্তি হয় মনে!

নীলিমা দেবী প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে বারান্দায় উঠেন। কৈ, কারুরই তো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না? মণি, রিণি কোথায়? পড়া-শোনা করছে কৈ? এখনি ঘুমিয়ে পড়লো নাকি সাত-সকালে? কী যে জ্বালা হয়েছে? উনিই বা করছেন কি? বিরক্তিতে চোখ দুটি কুঁচকে আসে। ও দুটোকে একটু কি দেখতেও পারেন না? অভিমানে বুকখানি ফুঁসে ওঠে। চোখে ঘনায় হুশ্চিন্তার ছায়া। সারাদিনের প্রায় উপোসী দেহে ক্লান্তি আরও ছাপিয়ে ওঠে। মন হ'য়ে ওঠে উত্তপ্ত।

দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যান নীলিমা দেবী।



পাশের ফ্লাটে ছেলেমেয়েরা পড়ছে সুর ক'রে কানে আসে। ওদের মা কি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন শোনা যায়। তেতলার মেয়েটি গান গাইছে হারমোনিয়াম বাজিয়ে। হয়তো মাঠার মশাই এসেছেন। চার পাশেই আলো, হাসি, গান, প্রাণের চাঞ্চল্য, জীবনের জয়োল্লাস। নীলিমা দেবীর ফ্লাটটি স্তব্ধ, নীরব, বাক্যহারা, মৃতবৎ, নিস্তব্ধ।

কী রে বাবা! সব গেল কোথায়? হোল কি, মন উৎকণ্ঠায় ভাবি হ'য়ে এলো—। রাগ চাপা পড়লো দুশ্চিন্তার পাষণ্ড ভারে। ক্ষিপ্ত হাতে ফ্লাটের দরজাটি টেনে খুলে ফেললেন নীলিমা।

পাশাপাশি তিনটি ঘরের ফ্লাট। দুটি ঘর অন্ধকার। একটি থেকে কেবল আলোর রশ্মি দেখা যায়। ঘরের দোরটি ভেজান। নীলিমা দেবী ঘরের সামনেকার সরু বারান্দাখানির ওপর এসে দাঁড়ালেন। বারান্দাঘরের দিকে চেয়ে দেখলেন শিকল তোলা। মানদা চলে গেছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার পরই সে খাবার ঢাকা দিখে বেথে চলে যায়। দিনের কর্তব্য ওর শেষ হয়। একদিনও এর ব্যতিক্রম হবার যো নাই। সনিঃস্থাসে ভাবলেন নীলিমা দেবী—মাইনে করা লোক। কতটুকু আর আশা করা যায়? লঘু হাতে দোরটি ঠেলে ভেতরে ঢোকেন নীলিমা দেবী।

ঘরে আলো জ্বলছে। স্বামী ব'সে রয়েছেন জানালার ধারে ঈজি চেয়ারে। পা'ছুটি চেয়ারের হাতলে প্রসারিত। হাতে ধরা বই একখানি। চেয়ে রয়েছেন বাইরের দিকে জানালা গলিয়ে। মেঝের মাড়র পাতা। মনি গুটাপুটি হ'য়ে ঘুমিয়ে রয়েছে মাড়রের কোণায়।



মাতুরের আর-এক পাশে বসে খাতায় কি যেন লিখছে রিনি। দরজার আওয়াজ পেয়ে রাজেনবাবু ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন। রিনিও চাইলে মায়ের দিকে খাতা থেকে চোখ তুলে। চোখ দুটি যেন ছলো-ছলো রিনির। নীলিমা দেবী ঘরের ভেতরটা চেয়ে দেখলেন ভাল করে। ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করলেন। কেমন যেন বেসুরো মনে হয়। যেন একটু অগ্র রকম। রুক্ষ চুলে ঢাকা কপালখানিতে কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে ধীরে-ধীরে।

নীলিমা দেবী ধীর পায়ে ঘরে এসে ঢোকেন। হাত ব্যাগটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখেন। আস্তে-আস্তে স্বামীর চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।—আফিস থেকে ফিরে জলখাবার খেয়েছ তুমি? শরীর ভাল আছে তো? নীলিমা দেবী ব্যস্ত কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীর দিক থেকে কোন জবাব আসে না। মুখখানি আবার জানালার দিকে ঘুরিয়ে বসেন রাজেনবাবু। নীলিমা দেবী মেয়ের দিকে ফিরে শুধালেন—তোরা বিকেলে সময়মত খেয়েছিলি তো? ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—মনি এখনি ঘুমিয়ে পড়লো যে? পড়তে বসাননি ওকে? মেয়ে একবার বাপের মুখের দিকে আর একবার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে খাতার ওপর ঝুঁকে পড়লো।

নীলিমা দেবী কিছু বুঝলেন। কথা আর বাড়ালেন না। একটু সময় ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আলনা থেকে কাপড়-জামা নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

রাত্রি গভীর। নগরী অশুশ্রুত। রাস্তার আলোগুলি পাহারা দিয়েছে রাত জেগে। আলোর চোখেও ঘুমের কুহেলী। জড়িয়ে



আসছে চোখের পাতা। জোর ক'রে চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইট-পোষ্টগুলি। করছে কর্তব্য প্রতিপালন। নগরীর যুমন্ত দেহ কুয়াশার চাদরে ঢাকা। আকাশে ইতস্তত মেঘের আনাগোনা। দূরে কোথায় বেজে উঠলো রিক্সার টুং-টাং শব্দ। জেগে উঠলো শিশুর কান্না নীচের ভাড়াটেদের ঘর থেকে।

নীলিমা দেবী পাশ ফিরে গুলেন। যুম আসছে না ভাল করে। পাতলা তন্দ্রা ভেঙ্গে যাচ্ছে, হঠাৎ চেয়ে দেখলেন ঘরের ওপাশে ঘুমিয়ে রয়েছে ছেলে-মেয়ে দুটি আলাদা খাটে। ছেলেটির মাথা বালিশ থেকে নীচে গড়িয়ে পড়েছে। মুখখানি স্নান যেন। রাস্তার আলো এসে পড়েছে ওদের মুখে। কেমন যেন অসহায় বোধ হচ্ছে ছেলে-মেয়ে দুটিকে। মুখের গড়ন যেন আরও লম্বাটে হ'য়ে গেছে। হাত-পা-গুলো হ'য়ে পড়েছে সরু-সরু। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো নীলিমা দেবীর। চোখের পাতা এলো ভারি হয়ে। বালিশে চোখ-দুটি রগড়ে নিলেন একবার। চোখের দৃষ্টি আবার তক্ষুণি গিয়ে লুটিয়ে পড়লো ওদের সর্বাপেক্ষে।

আহা! মন ফুঁপিয়ে উঠলো। নিঃশ্বাস এলো বিলম্বিত হ'য়ে। সারাদিন নীলিমা দেবী বাইরে কাটান। স্বামীও থাকেন ওঁর অফিস নিয়ে। গা'ছাড়া পুরুষ মানুষ তিনি, ঘর-সংসারের কতটুকু বা বোঝেন? ছেলে-মেয়ের যত্নেরই বা জানেন কি, যে ছেলে-মেয়ে দেখবেন? আর, ওঁকেই বা দেখছে কে? কে করছে একটু যত্নআতি, তাই খুবই খিট-খিটে হ'য়ে উঠেছেন ইদানীং। ছেলে-মেয়ে দুটি ভাই কাছে ঘেঁসতেই ভয় পায়। একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক ঠেলে। —পুরুষ মানুষ।



একটু আদর-যত্ন পেতে চান। তা' না পেলে ওঁদের মন-মেজাজ ঠিক থাকে না। সবই বোঝেন নীলিমা দেবী। কিন্তু উপায় কি? কী তিনি করতে পারেন? এদের স্থখে রাখবার জন্তেই তো তাঁর চাকুরী নেওয়া? সংসার একটু সচ্ছল হবে বলেই না স্বামীর প্রায় অমতেই তাঁর এই শিক্ষিকার কাজটি করা? যে দিনকাল পড়েছে তাতে একজনের উপার্জনের টাকায় কি আর সংসার ভাল ভাবে চলে? নাকি ছেলে-মেয়ে ঠিকমত মানুষ করা যায়? কিছুই বুঝতে চান না উনি। কী যে বিপদ হয়েছে নীলিমা দেবীর? আর ভাবতে পারা যায় না। নীলিমা দেবী পাশ ফিরলেন। স্বামীর দিকে মুখ করে শুলেন। পিছন ফিরে শুয়ে রয়েছেন স্বামী। হাতখানি মাথার ওপর দিকে ফেলা। চুলগুলি অবিব্রত। বেশ বড়ও হয়েছে চুলগুলি, বাঁকড়া একরাশি চুলে মাথাটি ঢাকা। হয়তো কতদিন কাটা হয় না, অমন কালো মিশমিশে চুলগুলিতে একটু লালচে আভাও নেমেছে যেন। —যে ভুলো মানুষ! কোন দিকেই খেয়াল থাকে না তাঁর। এতোদিন নীলিমা দেবীই হুঁস্ করিয়ে দিয়েছেন সব। হয়েছেও সব ঠিকমত। এখন এতো দিকে নজর দেবার সময় নাই। —তাই হয়ও না কিছুই। নীলিমা দেবীর ভ্রূটি কুঞ্চিত হয় একটু। কপালে রেখা জাগে দুটি-একটি। মনটা ইষৎ উত্তপ্ত হয়। —নিজের টুকুও কি করতে পারেন না সময় মত? কী যে জ্বালা হয়েছে বাপু! কিছুই ভাল লাগে না ছাই!—

রুপা মাথাটায় আঙ্গুল চালিয়ে চুলগুলি একটু গুছিয়ে দিতে যান নীলিমা দেবী। —ইস্, মাথাটা একেবারে ভিছে গেছে ঘামে।



উন্মুক্ত পিঠ গড়িয়েও নেমেছে ঘামের ধারা। সুগৌর পিঠখানি চিক-চিক্ করছে ঘামের মুক্তাবিন্দুতে। আঁচল দিয়ে পিঠখানা মুছিয়ে দিলেন। মুছে দিলেন ঘাড় ও গলা। হাত পাখাখানা নেড়ে হাওয়া করতে লাগলেন মৃদু-মৃদু।

স্বামী পাশ ফিরে গুলেন। চেয়ে দেখলেন একবার। নীলিমা দেবী শুধালেন—ভাল ঘুম হচ্ছে না তোমার? গরম হচ্ছে? স্বামী কথা কইলেন না। উঠে বসে মাথার শিয়রে তে-পায়ার রাখা জলের গ্লাসটি নিয়ে জল খেলেন ঢকঢকিয়ে। নীলিমা দেবী বললেন—আমাকে বললেই তো জল দিতে পারতাম আমি। তুমি আবার উঠে নিতে গেলে কেন?

স্বামী গম্ভীর স্বরে বললেন—তাতে আর কি হয়েছে, সব সময়ে তো নিজেই নিই। ওসব অভ্যাস হ'য়ে গেছে। তা'ছাড়া নিজের দরকারী কাজ নিজেই করা ভাল, মিছামিছি তোমাকে কষ্ট দিতে যাব কেন? রাজেনবাবু শুয়ে পড়লেন আবার। তোমার কি রাগ হয়েছে? বিরক্ত হয়েছ তুমি আমার উপর? কেন, কি করেছি আমি? গলার স্বরটি কেঁপে গেল ঈষৎ। রাজেনবাবু কথা কইলেন না। চুপ্ করে শুয়ে রইলেন চোখ বুঁজে। —কী, বললে না? বলো না কেন রাগ করেছ তুমি? —নীলিমা দেবী বুঁকে পড়লেন স্বামীর বুকের উপর। —সেই সন্ধ্যাবেলা এসে পর্য্যন্ত দেখছি, কি যেন হয়েছে তোমার। অথচ আমাকে কিছুই বল্ছো না। শুন্ হয়ে রয়েছ। বলো না লক্ষ্মীটি, কী হয়েছে? কেন বকেছিলে মনি রিনিকে? কী করেছিলো ওরা? স্বামীর কপাল থেকে এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে



দিলেন নীলিমা দেবী। কপাল খানি মুছে নিলেন আঙ্গুলের ডগায়  
 আঁচল জড়িয়ে। স্বামীর চোখে চোখ রেখে চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ।  
 তারপর বললেন অভিমান-ক্লিষ্ট স্বরে—কেন! আমি কি সংসারের কেউ  
 নই? কিছুই আমাকে বলার দরকার করে না? ছেলে-মেয়ের বিষয়েও  
 কিছু শুনতে পাবো না আমি? কিছুই তুমি বলবে না আমাকে?  
 বেশ, তার কণ্ঠ বুঁজে গেল। চোখের পাতা উঠলো থরথরিয়ে  
 কেঁপে। ঝরে পড়লো কয়েক ফোঁটা চোখের জল স্বামীর বুকের উপর।

রাজেনবাবু চোখ মেলে চাইলেন। নড়েচড়ে গুলেন একবার।  
 ভারি গলায় বললেন—তুমি আবার কি শুনবে? তোমার সময় কোথায়?  
 তুমি টাকা উপায় করে আনছো, ব্যাস্, কর্তব্য। সংসার এদিকে  
 হেজেই যাক্, আর মজেই যাক্, তোমার তো দেখবার কথা নয়!  
 ছেলে-মেয়ের কি হোল না হোল, তাই বা তুমি দেখবে কখন?  
 তোমার স্কুল রয়েছে, বাইরের কাজকর্ম রয়েছে, এসব সামান্য ব্যাপারে  
 নজর দিতে গেলে কি তোমার চলে? যাক্গে ওসব কথা, ঘুমাই  
 একটু। রাজেনবাবু চোখ বুজলেন আবার।

নীলিমা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। আঁচল দিয়ে চোখ দুটি  
 রগড়ে নিলেন একবার। তারপর বললেন—হ্যাঁ, আজ আমার ফিরতে  
 অনেকটা দেরী হ'য়ে গেছে সত্যি। স্কুলে একটা মিটিং ছিল। না  
 হ'লে রোজই তো প্রায় পাঁচটায়ই ফিরি? এসে আবার ঘরসংসার  
 দেখি, ছেলে-মেয়ের তদারক করি। 'একদিনেই এতো? রাজেনবাবু  
 ঈষৎ উষ্ণ স্বরে জবাব দিলেন—বেশ তো, রোজই তুমি দেরী ক'রে  
 বাড়ী ফেরো না, আমার বলবার কি আছে? নিজের ঘরসংসার,



নিজের ছেলে-মেয়ে, নিজে যা ভাল বুঝবে করবে। অত্রে বলতেই বা যাবে কেন? আর তা' তুমি শুনবেই বা কিসের জন্তে? রাজেন-বাবু চুপ্ করলেন। টেবিলের ওপর ঘড়িটি নিঃশ্বাস ফেললো টিক্-টিক্। মনি কি যেন বিড় বিড় ক'রে ব'লে পাশ ফিরে গুলো।

রাজেনবাবু সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন। আপন মনেই বল-লেন তারপর—আমার জন্তে কাউকে ভাবতে বলি না। আমার খাওয়া-দাওয়াও কাউকে দেখতে হবে না। বাড়ীতে সুবিধা না হয়, সহরে রেঞ্জেরেণ্টের তো আর আর দু'ভিক্ষ পড়েনি? যদিকে মন চাইবে, বেড়িয়ে পড়বো! চুপ করলেন রাজেনবাবু। ঘরের ভিতর স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। নীলিমা দেবী নড়ে-চড়ে বসলেন। পিঠের ওপর ভেঙ্গে-পড়া খোঁপা বেঁধে নিলেন দু'হাত দিয়ে। ধীরে-ধীরে বললেন, ব্যথিতস্বরে—আজ আমার সত্যিই দেবী হয়েছে। রোজই তো আর হয় না এমন! রাজেনবাবু বালিশ থেকে মাথা তুলে আধ-শোয়া হ'য়ে বসলেন—রোজ হয় না ঠিক, কিন্তু প্রায়ই হচ্ছে আজ-কাল। আজ মিটিং, কাল পার্টি লেগেই রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। যত বাইরের জগতে পরিচিত হচ্ছে, ঘরে ফেরার সময় ততই পেছু হঠ্ছে ধীরে-ধীরে। স্কুলে পড়াচ্ছ—পরের ছেলে মানুষ করছো, ভাল কথা—পরোপকার করা মন্দ নয়? তারা যে ভেসে যাচ্ছে, তা সামলাবে কে? তার জন্তে নিজের কাছে দায়ী হ'তে হবে না ভবিষ্যতে? হবে না তার ফল ভোগ করতে? জোরে-জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেললেন রাজেনবাবু। স্বর নীচু করে আবার বললেন—সংসারে কয়েকটা টাকার সাশ্রয় করে, সে অশান্তির হাত কি এড়াতে পারা যাবে? চুপ্ কর-



লেন তিনি। মাথাটাকে বালিশের ওপর এলিয়ে দিলেন।

নীলিমা দেবী বিচলিতা হলেন। চোখের দৃষ্টিতে উৎকর্ষা জেগে উঠলো। গলার স্বরে জাগলো ঈষৎ কম্পন। স্বামীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন—কেন? কী করেছে ওরা? আমি তো কিছুই জানতে পারিনি? মানদা তো কিছু বলেও না? সেই তো ওদের দেখাশুনা করে। না বললে জানবোই বা কি করে? রাজেনবাবু থম্‌থমে গলায় জবাব দিলেন—মানদা বলতে যাবে কেন? তার গরজ কিসের? তার সঙ্গে মাইনের সম্পর্ক। এতো সব ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলে তার চলবে কেন? এদের কিছু খারাপ হলে, মানদার তো তার জন্ত ফল ভোগ করতে হবে না? তলা হাতড়ে দেশলাই বার ক’রে রাজেনবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। খানিকক্ষণ চোখ বুজে ধূমপান করলেন তিনি। তারপর আবার বললেন—এই তো, তোমার ছেলের ডান চোখটা বুঁজে যেত। সকালে উঠলে দেখো চোখটার অবস্থা কি হয়েছে। সারা বিকেল না খেয়েদেয়ে ও-পাড়ার বাঙ্গরদের ছেলের সঙ্গে ডাংগুলি খেলেছে। আর মার খেয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরেছে কাঁদতে-কাঁদতে। চেহারার দিকে চেয়ে দেখো একবার রাজেনবাবু ধোঁয়ার কুণ্ডলীটির দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে।

নীলিমা দেবী স্বামীর বুক ঘেঁসে সরে এলেন আরও। তাঁর তপ্ত নিঃশ্বাস রাজেনবাবুর চিবুকে স্পর্শ করলো। জ্রীর উৎকর্ষা-ব্যাকুল চোখের দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন—আর কতটি তো প্রায় রোজই স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছেন। কোথা থেকে যে



পয়সা যোগাড় করেন, তা তিনিই জানেন। ভাইটিকে একটাবার দেখবারও ফুরসৎ পান না মেয়ে! এমনি তার শিক্ষাদীক্ষার বহর। রাজেনবাবু কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেন—কানে আসে সবই। কিন্তু বল্বো কাকে? আর গুনছেই বা কে? রাজেনবাবু চুপ্ করলেন। হাত-পা ছড়িয়ে বিছানার ওপর গুয়ে পড়লেন চিং হ'য়ে। বিড়-বিড় করে বললেন আপন মনে—হু'জনায় মিলে তো টাকা রোজ-গার করা হচ্ছে, অথচ সংসারে যা সাশ্রয় হচ্ছে তা' আমিই জানি। এই তো মাসকাবারে গৃহস্থালীর সব জিনিষই হিসেব ক'রে কিনে দেওয়া হয়েছে। তবুও তুমি বাড়ী থেকে বেরোলেই—এটা ফুরিয়েছে, ওটা এনে দিতে হবে—লেগেই আছে। ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে হুকুম তামিল করতে হয়। তা' ছাড়া নিজের-নিজের সংসার পয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাখলে এ রকমটা হবেই। রাজেনবাবু হাই তুললেন একটা। আড়ামোড়া ভেঙ্গে আরাম ক'রে গুলেন।

থানার ঘড়িতে ঢং-ঢং-ঢং তিনটা বাজলো। ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ কুকুর ডেকে উঠলো পাড়ার কোথায়। রাস্তা কাঁপিয়ে একখানা মোটর বেড়িয়ে গেল গলি থেকে। রাজেনবাবু পাশ ফিরলেন,—আপন মনে বললেন—যাগগে, দেখা যাক্ অদৃষ্ট কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। এবার একটু ঘুমানো যাক্। সকালে উঠে তো আবার—চোখ বুঁজলেন তিনি।

নীলিমা দেবী বসে রইলেন, হাঁটুর ওপরে খুতনী রেখে। সাড়ে তিনটা বাজলো। আস্তে-আস্তে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি ছেলে-মেয়ের খাটের পাশে। মণির মাথাটাকে তুলে দিলেন বালিশের ওপর।



